আলেক্সান্দর পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

আলেক্সান্দর পুশকিন · কবিতা ১

...পুশকিন সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভাধর, সেই মহান ঐতিহাসিক চরিত্রদের একজন যাঁরা বর্তমানের জন্যে খেটে ভবিষ্যতের আয়োজন করেন।

ভিস্সারিওন বেলিন্স্কি

...পুশকিন... রাশিয়ার মহান জাতীয় কবি, মোহনীয় রূপারোপে ও প্রজ্ঞায় বিধৃত রূপকথার স্রষ্টা, প্রথম বাস্তববাদী কাব্যোপন্যাস 'ইয়েভ্গেনি অনেগিন'-এর রচয়িতা, আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক 'বরিস গদুনোভ'-এর নাট্যকার, এমন এক কবি তিনি কবিতার লালিত্যে, আবেগ ও চিন্তার প্রকাশ-শক্তিতে যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, যিনি কবি এবং মহান রুশ সাহিত্যের জনক।

মাক্সিম গোর্কি

আলেক্সান্দর
পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

আ. পুশকিন
ও. কিপ্রেন্‌স্কি কৃত পোরট্রেট, ১৮২৭

আলেক্সান্দর পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

দুই খণ্ডে

✲

প্রথম খণ্ড

কবিতা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: দ. অরলোভ

Александр Пушкин

ИЗБРАННАЯ ПОЭЗИЯ

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

П $\frac{70301—634}{014(01)—80}$ 648—80 4702001000

সূচি

টীকা

পুশকিন-প্রসঙ্গে

জীবন ও সৃষ্টিশক্তির প্রারম্ভেই প্রাণাবসান হলেও পুশকিন সর্বদা রয়ে গেছেন তাঁর শিষ্য ও ধারাবাহকদের কাছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের দিক্‌পালদের কাছে — স্বয়ং লেভ তলস্তয়ও যার ব্যতিক্রম নন — সর্বজ্যেষ্ঠ ও প্রাজ্ঞতম। সকলের কাছেই তিনি তা-ই — বয়সের দিক দিয়ে তাঁরা পুশকিনকে যতই ছাড়িয়ে যান। বর্তমানে আমাদের সকলের কাছেও তিনি তা-ই, এমন কি আরো বড়ো, কেননা পূর্ববর্তীরা যে পুশকিনকে জানেন তিনি তার চেয়েও মহত্তর।

ভ. গ. বেলিন্‌স্কি লিখেছেন:

'পুশকিন তেমনই একটা চির জীবন্ত ও গতিষ্ণু ব্যাপার যা মৃত্যুর বিন্দুটাতেই থেমে যায় না, সমাজের চেতনায় তার পরিবিকাশ চলতেই থাকে।'

মহান এক সাহিত্য, যার বিশ্ব-তাৎপর্য বহুকাল সন্দেহাতীত ও অটুট, তার জনক ও স্রষ্টার প্রতিভাকে প্রতিপক্ষীয়রাও ছোটো করে দেখার চেষ্টা করে না, আর আমাদের বিশাল বহুজাতিক দেশে তো তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয়, আদরণীয়, বহুপঠিত কবি।

এটিও পুশকিনের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য যে যেমন-তেমন, খারাপ রচনা তিনি স্রেফ লিখতেই পারতেন না: এমনকি তাঁর অনুকরণধর্মী আদি কবিতাগুলিও তখনকার রুশ কাব্যকৃতির মানোত্তীর্ণ এবং প্রায়শই তার ঊর্ধ্বে।

পুশকিনের স্বর্ণভাণ্ডারের তালিকা দিতে যাওয়া তেমন সহজ নয়: এ তো আর শুধু 'ইয়েভ্‌গেনি অনেগিন', 'বরিস গদুনোভ', 'ব্রোঞ্জ-

অশ্বারোহী', প্রেমের কবিতা, দার্শনিক কবিতার রত্নবাহী, ছোটো ছোটো ট্র্যাজেডি, রূপকথা, 'ক্যাপটেনের মেয়ে' এবং তাঁর অন্যান্য কথাসাহিত্য নয়, সেইসঙ্গে আছে সমালোচনা-প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ঈশ্বর জানেন আরো কী, পত্রলিখন-রীতির অপূর্ব নিদর্শনও বাদ যায় নি।

পুশকিন-প্রসঙ্গে 'নৈপুণ্য' কথাটা ব্যবহার করতে কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সম্ভবত 'যাদু' হবে বেশি উপযোগী, যদিও আমরা ভালোই জানি, 'কলালক্ষ্মীর বরপুত্র' যে পূর্ণতায় আমাদের অভিভূত করেন তার পেছনে আছে কী একাগ্র তাপসসুলভ পরিশ্রম।

তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি যখন দেখি তখন সত্যিই কল্পনা করা কঠিন হয় যে কবি বিক্ষিপ্ত নানা পঙক্তি আর শব্দকে তাঁর ইচ্ছাধীন করে কোনো একটা ধারায় সাজিয়েছেন মাত্র। না। মনে হয় যেন রচনাগুলি ওই একই রূপে ছিল বাস্তব জীবনে, প্রকৃতিতে, আর সেখান থেকে গোটাগুটিই তা তুলে নেওয়া হয়েছে।

প্রাণ তাঁর ধাবিত হয়েছিল শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও। নিজের যুগে নিজের সমকালীনদের সঙ্গে, নিজের সামাজিক স্তরের সঙ্গেই তিনি দিন কাটিয়েছেন, সেইসঙ্গে যেন ভবিষ্যৎ পুরুষদের সঙ্গেও, রয়েছেন আমাদের সঙ্গেও, থাকবেন তাদের সঙ্গেও যারা আসবে আমাদের জায়গায়।

পুশকিন যা রেখে গেছেন তা এক পলকের দৃষ্টিপাতে ধরা যাবে না; এ শুধু একটি অপরূপ গিরিশৃঙ্গ নয়, বহু শিখর ও অসংখ্য শাখা নিয়ে পরিব্যাপ্ত এক বিশাল পর্বতমালা এ।

আলেক্সান্দর ত্ভার্দোভ্স্কি

গীতিকবিতা

চাদায়েভের উদ্দেশে*

ভালোবাসা, আশা, মৃদুমন্দ যশে-মেশা
প্রবঞ্চনা আমাদের তোয়াজ করে নি দীর্ঘদিন।
কবে অন্তর্হিত নব তারুণ্যের নেশা,
স্বপ্ন হেন, ভোরের কুয়াশা হেন লীন।
তবু ক্রূর শাসনের নিগড়ে নির্জিত
আমাদের মনে জ্বলছে দুরন্ত বাসনা,
অসহিষ্ণু প্রাণ বীরব্রতে একমনা,
কানে দীপ্র স্বদেশের দূরপ্লাবী আহ্বান বিধৃত।
আশা-আশঙ্কার বুক-দুরুদুরু নিয়ে
মুক্তির মুহূর্ত গুনি, আমরা সব প্রতীক্ষায় থাকি —
অভিসার-মুহূর্তের আর কত বাকি
প্রণয়ী তরুণ যথা ভাবে বিচলিয়ে।
যতক্ষণ মুক্তি খুঁজি দীপ্ত বহ্নিশিখা,
বুক বাঁধি অভিমানে আত্মমর্যাদার,
বন্ধু, ততক্ষণ মাতৃভূমি অনিমিখা
এ-হৃদয়ে, দেব তারে অপরূপ হৃদয়-উৎসার!
কমরেড, বিশ্বাস রাখো, এই বলিলাম:
পূর্বাকাশে দেবে দেখা সৌভাগ্যের স্বাতী,
রাশিয়া উঠবেই জেগে নয়ন-আরাম,
চূর্ণ হবে স্বৈরতন্ত্র দুঃসহ অরাতি —

তারি ধ্বংসস্তূপ 'পরে কে লিখিবে আমাদের নাম!

(১৮১৮)

দিবাকরে এল সন্ধ্যাকাল

দিবাকরে এল সন্ধ্যাকাল;
কুয়াশায় ছেয়ে গেল বারিধির তীর।
হু-হু করো, হু-হু করো পাল
উত্তাল তরঙ্গ তোলো সাগর গম্ভীর।
দেখি আমি দূর উপকূল,
যাদুময় অঞ্চলের দক্ষিণী-সে দেশ:
বুকে দোলা, ব্যথা নিয়ে সেথা যাত্রা শেষ,
স্মৃতিভারে অধীর, আকুল...
টের পাই চোখে জল নামে-যে আবার;
উষ্ণ প্রাণ হিম হয়ে আসে;
পরিচিত স্বপ্ন সব হেথা-হোথা ভাসে;
মনে পড়ে পাগল সে প্রেম আগেকার
যা দিয়েছে পীড়া, যাতে মধুরে মাতাল,
আশার ছলনা যত মনে করে ভিড়...
হু-হু করো, হু-হু করো পাল,
উত্তাল তরঙ্গ তোলো সাগর গম্ভীর।
ধাও তরী, নিয়ে চলো দূর অজানায়
খল সাগরের শত ভয়াল খেয়ালে,
শুধু নয় মাতৃভূমি, তারও সীমানায়
কুয়াশায় ঢাকা সেই দেশে দূর কালে
প্রথম কী প্রেম বুকে জেগে
লেলিহান জ্বলেছে আবেগে,

মোর পানে কলালক্ষ্মী হেসেছে আড়ালে,
যেখানে অকালে গেল ঝরে
অপচিত আমার যৌবন,
যেখানে শীতল বুকে দাহ অনুক্ষণ
লঘুপক্ষ পুলকের ছলনায় পড়ে।
হব আমি নতুনে মাতাল,
ছেড়ে যাই স্বদেশ আমার,
ছেড়ে যাই তোমাদেরে ভোগের দুলাল,
ক্ষণিক যৌবন-সাথী, ক্ষণ স্থিতি যার;
আর যত পাতকিনী প্রজাপতি-পাল,
প্রেমহীন, পায়ে যার বিকিয়ে দিলাম
একদিন শান্তি, মুক্তি, আত্মা ও সুনাম —
তোমাদেরও গেছি ভুলে, লীলা হল ঢের,
ভুলে গেছি বসন্তের গুপ্ত সখিদের...
হিয়া তবু নহে কেন স্থির,
প্রেমের গভীর ক্ষত সারাল না কাল...
হু-হু করো, হু-হু করো পাল,
উত্তাল তরঙ্গ তোলো সাগর গম্ভীর...

(১৮২০)

আকাশে ক্রমশ...

আকাশে ক্রমশ মেঘ হয়ে আসে হারা।
বিষণ্ণ তারা, ওগো সন্ধ্যার তারা!
রুপোলি কিরণে রাঙিয়ে দিলে যে তুমি
নিদ্রালু উপসাগর, পাহাড়, ভূমি।
তোমার ক্ষীণাভ আলো আমি ভালোবাসি,
জাগিয়ে তোলে তা সুপ্ত চিন্তারাশি:
তোমার উদয় মনে পড়ে সেই দেশে
যেখানে শান্তি, যেখানে মধুর হেসে
সুঠাম সুডৌল পপলার মাথা তোলে,
স্নিগ্ধ গুল্ম, সাইপ্রেস গাছ ঢোলে,
যেখানে মিষ্টি কল্লোলে ঢেউ ধায়,
সেখানে একদা পাহাড়ে কী ভাবনায়
ঘুরেছি, কুটির তমসায় গেল ছেয়ে,
তোমারে খুঁজতে এসেছিল এক মেয়ে,
সখিদের কাছে বলছে সে, শুনলাম,
তোমায় চেনাতে জানালে নিজেরই নাম।

(১৮২০)

শৈশবে কৃত পুশকিনের একটি মিনিয়েচার

পুশকিনের জন্মকালে মস্কো। ক্রেমলিনে চুদোভ প্রাসাদের দৃশ্য।
এনগ্রেভিঙ, ১৭৯৯
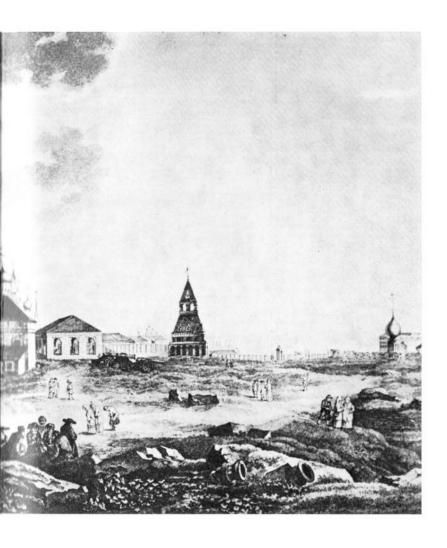
সের্গেই পুশকিন (১৭৭০-১৮৪৮), কবির পিতা।

নাদেজদা পুশকিনা, পিতৃপদবি হানিবল (১৭৭৫-১৮৩৬), কবির মাতা।

বন্দী

আর্দ্র অন্ধকূপ-কারা, বন্দী আমি একা।
জানলা দিয়ে প্রাঙ্গণেতে যাচ্ছে ওই দেখা
তরুণ ঈগল এক — বন্দী সে খাঁচায়,
বন্ধু মোর রক্তমাখা খাদ্য ঠোকরায়।

হঠাৎ খাবার ফেলে জানলায় তাকিয়ে
যেন সে আমার মতো একই চিন্তা নিয়ে
দৃষ্টি হানে, ডেকে ওঠে — বুঝি আমাকেই
বলতে চায়: 'চল বন্ধু, যাই উড়ে হে-ই!'

'আমরা স্বাধীন পাখি, চল মেঘপার
যাই — যেথা ডাকে দূরে ধবল পাহাড়,
সমুদ্র যেখানে নীল নভে আমন্ত্রণ
পায়, যেথা মত্ত ঝড়ে মোর বিচরণ।...'

(১৮২২)

রাত

আমার কণ্ঠ ধায় তোমা' পানে সোহাগ-মধুর, উচাটন,
রাত-দুপুরের কালো নির্জন শিহরিত... মোমে স্পন্দন
শয্যা-শিয়রে বিষণ্ণ মোম জ্বলে...
আমার কবিতা শতস্রোতে বয় গান গেয়ে কলকলে
শত স্রোত মেলে প্রেমের প্রবাহে তোমাতে পূর্ণ হয়ে।
আমি দেখি দুটি চোখ ঝিকিমিকি — মোর পানে আছ চেয়ে,
ফুটফুট হাসি উপচায় চোখে, যেন কানে শুনি ভাষা তার:
প্রিয়তম... আমি ভালোবাসি... আমি তোমার, তোমারই, ও তোমার।

(১৮২৩)

সমুদ্র, বিদায়*

বিদায়, স্বাধীন হে আদিশক্তি, বিদায়!
এস, এই শেষ পায়ে বিলি কাটো চুপে,
নীল তরঙ্গে পুচ্ছ দাপাও নিদয়,
ঝলমল কর মহিমান্বিত রূপে।

বন্ধু যেমন বিষণ্ণ গুঞ্জনে
বিদায়ের ক্ষণে পিছু ডাকে সে আমার,
তেমনি তোমার হাতছানি মৃদু স্বনে
কানে আসে এই শেষবার, বারবার।

হে অসীম, মোর সকল সাধের সীমা!
কতদিন আমি তোর বালুতট ভেঙে
সুগোপন সাধ-স্বপ্নের মধুরিমা
বুকে বয়ে হে'টে গেছি নানারঙে রেঙে।

কী ভালো লেগেছে যবে তুই নিচু সুরে
সায় দিয়েছিস — অতলগভীর সাড়া,
কী-যে ভালো তোর সন্ধ্যা বাক্যহারা,
তোর দুর্জয় গর্জন কান জুড়ে।

পালতোলা ছোট জেলেডিঙি যায় ভেসে —
তোর খেয়ালের খেলনা সে — পাড়ি তার
ঢেউ থেকে ঢেউয়ে নির্ভয়ে হেসে-হেসে,
অথচ সওদাগরি জাহাজের সার
ফুঁসে উঠে তুই ডুবাস-যে অক্লেশে।

কত-যে ভেবেছি চিরকাল তরে এই
অনড় বিরস বালুবেলা যাই ছেড়ে,
সোল্লাসে তোর ডানায় উড়াল দেই,
তোর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উত্তাল ছোটাতেই
চেয়েছি আমার গানের নৌকা যে-রে।

তুই ডেকে-ডেকে পথ চেয়েছিস, আমি
শৃঙ্খল ছিঁড়ে যেতে চাহিলাম বৃথা;
রয়ে গেছি শেষে এই বালুতীরে থামি'
প্রবল বাসনায়ূপে-বাঁধা, জানো কি তা!

হায় রে মিথ্যে আপসোস! হায়, এখন
কোন পথে মোর যাত্রা নিরঙ্কুশ?..
ও-জলরাশিতে আছে কি চিহ্ন এমন
উন্মন মনে এনে দিতে পারে হুঁশ!

আছে এক দ্বীপ, সমাধির শিলা*, নিচে
শীতল নিদ্রা ঢাকে মহিমার স্মৃতি:
সেখানে নির্বাপিত নাপলিয়ঁ, কী-যে
অশান্ত প্রাণ লভিয়াছে সুনিভৃতি!

নাপলিয়ঁ মৃত। পিছু-পিছু এল ছুটে
আরও এক ঝড়, ঝড়-ঝঞ্ঝনা তবু —

নিল আমাদের আরেক প্রতিভা লুটে*,
মোদের আরেক হৃদয়-মনের প্রভু।

মাটিতে নামিয়ে যশের মুকুট ও কে
অন্তর্হিত হল, শোকাতুর মুক্তি,
সাগর, তুমিও কাঁদো, ফুঁসে ওঠো শোকে:
ও ছিল তোমার চারণ, তোমার শুক্তি!

তোমারই আদলে তার প্রমত্ত প্রাণ
গড়া ছিল, তুই জননী ধাত্রী তার:
তোরই মতো সে-যে দুর্দম, অফুরান,
অতল বিষাদ, বশ মানে নি কো কার।

শূন্য এখন বিশ্ব... তুই কোথায়
আমারে এবার নিয়ে যাবি, রে জলধি?
নরের ভাগ্য সবঠাঁই একই হায়!
যেথা কল্যাণ সেখানেই পাহারায়
স্বর্ণ এবং স্বেচ্ছাচারীরা যদি।

বিদায়, জলধি! যেথা যাই কোনোখানে
ভুলিব না তোর ধীর-মহিম্ন রূপে,
বহু-বহু দিন ধরিয়া রাখিব কানে
তোর কল্লোল, তোর মৃদুভাষ চুপে।

যেথা যাই — দিই অরণ্য-মরু পাড়ি —
তোরে বুকে নিয়ে মিটাব তৃষার জ্বালা,
সাথে নেব তোর তট, শিলাময় খাঁড়ি,
ঝলকিত আলোছায়া ও ঊর্মিমালা।

(১৮২৪)

বাখ্‌চিসারাই প্রাসাদের ফোয়ারার উদ্দেশে

তোর তরে দুটি ফুল — মেদুর গোলাপ,
প্রেমের ফোয়ারা তুই। জীবনী ফোয়ারা,
ভালোবাসি তোর ওই মুখর আলাপ,
কবিতার ছোঁয়া-লাগা তোর অশ্রুধারা।

রাশি-রাশি রজতের কণা এসে মোরে
অভিষিক্ত করে দেয় শিশিরে শীতল,
উৎসারিত হয়ে ওঠো আনন্দের জল,
তোমার কাহিনী বলো ঝিরিঝিরি করে।

প্রেমের ফোয়ারা তুই, বিষাদ-ফোয়ারা,
তোমার মর্মরে আমি শুনেছি তো সব
সুখ-দুঃখ নিয়ে দূর দেশে ছিল কারা,
মারিয়ার কথাতে তো থেকেছ নীরব...

হারেমের তারা তুমি, ম্লান, অনুজ্জ্বল,
এখানেও তুমি আজ বিস্মৃত ললনা?
অথবা মারিয়া আর জারেমা কেবল
কোনো এক সুখাবেশে রচিত কল্পনা?

নাকি উৎকল্পনের কোনো এক ঘোর
জনহীন কুহেলির পটে দিল এঁকে
ক্ষণিকের তরে ভেসে-ওঠা মূর্তি তোর
মনেই আবছা কোনো পরাকাষ্ঠা রেখে।

(১৮২৪)

তোমাকে...*

অপরূপ সে-মুহূর্ত মনে পড়ে যায়:
আবির্ভূত হলে তুমি সম্মুখে আমার,
ক্ষণতরে দিলে দেখা যেন স্বপ্নপ্রায়,
অনাবিল সৌন্দর্যের শাশ্বত আধার।

তারপর এ-জীবনে বিষাদে, হতাশে,
অকারণ কোলাহলে, শশব্যস্ততায়
ওই প্রিয় মুখ কতদিন চোখে ভাসে
কমনীয় কণ্ঠস্বর কানে উথলায়।

কত-যে বছর কেটে গেল তারও পর,
তীব্র ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হল স্বপ্ন সেই,
কবে হারালাম কানে কম-কণ্ঠস্বর,
তোমার অনিন্দ্য রূপ ভুলিনু কবেই।

বিজন নৈঃসঙ্গ্যে একা হিম-তমিস্রায়
স্তব্ধ দীর্ঘায়ত কত কেটে গেল দিন,
দেবত্বে বঞ্চিত হয়ে, বিনা প্রেরণায়,
জীবনবিচ্ছিন্ন, অশ্রুহীন, প্রেম লীন।

আজি উদ্বোধিত সুপ্ত প্রাণ পুনরায়:
আবির্ভূত হলে ফের সম্মুখে আমার,
ক্ষণতরে দিলে দেখা যেন স্বপ্নপ্রায়,
অনাবিল সৌন্দর্যের শাশ্বত আধার।

হৃদয়স্পন্দনে লাগে এ কী উন্মাদনা!
উজ্জীবনে এ-হৃদয় নিকষিত হেম —
দেবত্ব জেগেছে, জাগে কী অনুপ্রেরণা,
জেগেছে জীবন, উদ্বেলিত অশ্রু, প্রেম।

(১৮২৫)

শীতসন্ধ্যা*

পৃথিবীর বুকে হাঁটে দুরন্ত ঝড়,
সঙ্গে কুয়াশা, তুষারকণারা ছোটে।
জন্তুর মতো গর্জে সে গরগর,
শিশুর মতোই কখনও কঁকিয়ে ওঠে।
কখনও খড়ের চালে উস্‌খুস, খেলে
ছাদে আমাদের, কভু জানালার কাচে
টোকা দেয় — যেন ফিরল ঘরের ছেলে
পথ না-ফুরাতে রাত যার ঘনায়েছে।

কুটির মোদের পুরানো, আঁধারে ভরা,
একটিই মোম মিটমিট করে শ্বসে...
ওগো, কেন এত বিষণ্ন মনমরা
চুপচাপ আছ জানালার পাশে বসে?
নাকি ঝড় এত বিলাপমুখর বলে
মৌন রয়েছ, হয়েছ বাক্যহারা?
নাকি চরকার মৃদু গুন্‌গুন বোলে
হাতছানি দেয় ঘুমপাড়ানির পাড়া?

এস এস মোর একার একক সাথী,
এ-নিরানন্দ যৌবনে সঙ্গিনী,
ফেনিল সুরায় দুঃখ ডুবাই, মাতি
ভরা পেয়ালায় তুলে দিয়ে রিনিঠিনি!

শোনাও আমায় মিষ্টি একটি গান
অনামা নদীর তীরে সেই মেয়ে — তার,
কিংবা ছোট্ট পাখিটি চপলপ্রাণ
ঘর যে ছাড়ে না সাত-সাগরের পার।

পৃথিবীর বুকে হাঁটে দুরন্ত ঝড়,
সঙ্গে কুয়াশা, তুষারকণারা ছোটে।
জন্তুর মতো গর্জে সে গরগর,
শিশুর মতোই কখনও কঁকিয়ে ওঠে।
এস এস মোর একার একক সাথী,
এ-নিরানন্দ যৌবনে সঙ্গিনী,
ফেনিল সুরায় দুঃখ ডুবাই, মাতি
ভরা পেয়ালায় তুলে দিয়ে রিনিঠিনি!

(১৮২৫)

পানোৎসব-সঙ্গীত

কেন চুপচাপ হৈ-হুল্লোড় উদ্দাম কলরব?
তোলো গলা, ধর ব্যাকাসের গান, রে ভক্ত পূজারীরা!
জয়ধ্বনিতে হোক-না মুখর সুতনুকা কুমারীরা,
আর আমাদের প্রেম-মুকুলিতা প্রেয়সী যুবতী সব!
ঢালো ঢালো সুরা পাত্রে-পাত্রে — দিয়ো
পাত্রের তলে ছুড়ে ঝন্‌ঝন
গাঢ় মদিরায় সফেন গহন
অঙ্গুলি হতে সাধের অঙ্গুরীয়!
এস, তুলে ধর উচ্চে পেয়ালা, ঠোকাঠুকি একসাথে!
জয়তু হে কলালক্ষ্মী! জয়তু প্রজ্ঞা! জাগো এ-রাতে!
এস প্রতিভার সূর্য, হও উদয়!
প্রদীপ যেমন ম্লান হতে-হতে ক্রমে
নব প্রভাতের উদ্ভাসে পায় লয়,
মিথ্যাবুদ্ধি মিটিমিটি তথা মিলায় তারায় সোমে
মৃত্যুহীন সে-চেতনাসূর্য দেখা দিলে একবার...
জয়তু সূর্য! পালাও পালাও রে মূঢ় অন্ধকার!

(১৮২৫)

দ্রষ্টা

তৃষার্ত হিয়া সুন্দর-সন্ধানে
ফিরিতেছিলাম মরুময় দেশে আমি,
এ-হেন সময়ে পথের প্রান্তখানে
দীপ্ত সে-এক দেবদূত এল নামি'।
ছুঁল সে আমার দুটি চোখ মৃদু হাতে
রাত্রে যেমন নামে ঘুম আঁখিপাতে:
অমনি সে-চোখে জাগে ভবিষ্যলোক
অনুকম্পাতে লভি' দ্রষ্টার চোখ।
কান যেই ছুঁল, ভরে গেল দুই কান
তুমুল অট্টরবে, গর্জন-গান
শুনি — আক্ষেপে দাপায় অন্তরীক্ষ
পাখার ঝাপট পরীদের দূরে নভে,
শুনি সমুদ্রে সরীসৃপ তান্ডবে
মাতে, প্রাণরসে ভরে যত বনবৃক্ষ।
মুখে ঝুঁকে পড়ে টেনে ছেঁড়ে জিহ্বা কি
দেবদূত সেই? — রসনা পাপের পাখি?
ছিঁড়ে লয় যত মিথ্যা, অলস ভাষা,
রক্তে-মাখানো হাত দেয় মুখে গুঁজে,
অধরোষ্ঠের মাঝখানে নেয় মুছে
সুতাশঙ্খের দ্বিজিহ্ব-বিষনেশা।
খোলা তরবারে চিরে সে আমার বুক
হৃৎপিন্ডটা উপড়িয়ে করে বার,

মুক্ত-কপাট হাহা-করা সিন্দুক
ফের ভরে এক জ্বলন্ত অঙ্গার।
কতকাল ছিনু প্রাণহীন, তারপর
দৈববাণীতে শুনিলাম কার স্বর:
'ওঠো, জাগো, তুমি শোনাও আমার বাণী,
আমার ইচ্ছা-তাড়িত হও-না পার
সমুদ্র-মরু, হানো বাণী সন্ধানী —
মানবহৃদয় পুড়ে হোক ছারখার।'

(১৮২৬)

শীতার্ত পথ

ঢেউ খেলে যায় ঘনঘোর কুয়াশায়,
তাহার রন্ধ্রে উঁকি দেয় ভীরু চাঁদ,
মনমরা মাঠে, বনের যত ফাঁকায়
ছন্নছাড়া সে জ্যোৎস্নার পাতে ফাঁদ।

শীতের রাস্তা একঘেয়ে, দুর্মর
ত্রইকা ছুটছে শিকারী কুকুর হেন,
ঝুন্‌ঝুন বাজে ঘুণ্টি ক্লান্তিকর,
ঝুন্‌ঝুন স্বর, শেষ নেই আর যেন।

গাড়োয়ান গান গেয়ে চলে একটানা,
কী যেন আছে সে-গানে অন্তরছোঁয়া,
কখনও গোপন ব্যথায় সে আন্‌মনা,
কভু উদ্দাম স্ফূর্তিতে বেপরোয়া...

আলো নেই কোনো, মিথ্যে কুটির খোঁজা...
ধু-ধু করে শুধু তুষার শুভ্র প্রেত...
ডোরাকাটা যত মাইলপোস্টেরা সোজা
ছুটে এসে পিছে পড়ে থাকে অনিকেত।

একঘেয়ে ঠেকে... তবু কাল আগামীতে
নিনা প্রিয়তমা — তার কাছে পৌঁছব,
তাকে দেখে আশ মিটবে না, কাছটিতে
চুল্লির ধারে বসে তন্ময় হব।

সশব্দে হেঁটে যাবে ঘড়িটার কাঁটা
তালে-তালে মেপে সময়-বৃত্ত চেনা,
মাঝরাতে তবু ঝমঝম ওর হাঁটা
মোদের দু'জনে বিচ্ছেদ ঘটাবে না।

বিষণ্ণ লাগে, ক্লান্তিকর এ-পথ,
গাড়োয়ান চুপ — ঢোলে তন্দ্রার সুখে,
বাজে একটানা ঘুণ্টির নহবত...
কুয়াশা ক্রমশ নামল চাঁদের মুখে।

(১৮২৬)

তের বছর বয়সে পুশকিন। 'ককেশাসে বন্দী' কাব্যের প্রথম সংস্করণে নিবদ্ধ এনগ্রেভিঙ, ১৮২২

ভাসিলি পুশকিন (১৭৬৭-১৮৩০), কবি এবং আলেক্সান্দরের জ্যেষ্ঠতাত।

ইয়েকাতেরিনা বাকুনিনা (১৭৯৫-১৮৬৯), পুশকিনের সহপাঠীর ভগিনী। লাইসিয়াম পর্বের ৩০টির বেশি কবিতা তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেন।

সেণ্ট পিটর্সবুর্গের নিকটে ত্সারস্কোয়ে সেলোতে ইয়েকাতেরিনিনস্কি প্রাসাদ। যে লাইসিয়ামে পুশকিন শিক্ষালাভ করেন সেটির অবস্থান ছিল ভবনের বাম পার্শ্বভাগে।

আন্তন দেলভিগ (১৭৯৮-১৮৩১), বিদ্যালয়ে পুশকিনের সতীর্থ, কবি। পুশকিনের অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধু।

ইভান পুশ্চিন (১৭৯৯-১৮৫৯), লাইসিয়ামের সময় থেকে পুশকিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডিসেম্বর অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্যে পুশ্চিন সাইবেরিয়ায় কয়েদ খাটুনিতে দণ্ডিত হন।

ধাইমা-কে

শৈশবে ছিলে প্রিয়সখী, ছিলে ওরে
দুঃসহ মোর জীবনের সঙ্গিনী!
পাইনবনের গভীরে বিজন ঘরে
পথ চেয়ে মোর আছ আজও কাল গুনি'।
জানলার পাশে বসে থাক ম্রিয়মাণা,
প্রতীক্ষা কর ঘড়িটার দোষ দেখে,
বলি-অঙ্কিত হাতে আশঙ্কা-মানা
পশমের কাঁটা থেমে যায় থেকে-থেকে।
বিস্মৃত-প্রায় ফটক ছাড়িয়ে দূরে
ছায়াঢাকা পথে চেয়ে থাক উন্মুখ:
কী-যে অশান্তি, উদ্বেগ কুরে-কুরে
খায় মনটারে, দলে-পিষে দেয় বুক —
কোন ছবি ভাসে ও-চোখে তোমার, কী-যে...

(১৮২৬)

সাইবেরিয়ায়...

খনির গভীরে বন্দী সাইবেরিয়ায় —
ধৈর্য ধর, অক্ষুণ্ণ রাখিয়ো অভিমান,
জেনো বৃথা যাবে না কো, কিছুই না-যায়
ফেলা — বন্ধ্যা শ্রম, উচ্চ চিন্তা, অপমান।

দুর্ভাগ্যের বিশ্বস্ত ভগিনী বিজয়িনী
আশা — দেবে লাঞ্ছিত ভূগর্ভে দৃপ্ত হানা,
উত্তরোল আনন্দের বাজাবে কিঙ্কিণী,
বাঞ্ছিত সময় পৌঁছে যাবে বে-ঠিকানা।

ভেঙে পড়বে অর্গলের মানা-দেয়া দ্বার,
পৌঁছবে তোমার কাছে মৈত্রী ভালোবাসা —
যেমন ও-কুঠুরিতে কয়েদখানার
পৌঁছয় আমার ডাক, মুক্ত শুদ্ধ ভাষা।

খসে পড়বে যন্ত্রণার নিগড় দুর্গতি,
ভেঙে পড়বে অন্ধকারা, দেউড়ি যাবে খুলে —
মুক্তি... মুক্তি বাহু তুলে জানাবে স্বাগত,
ভাইয়েরা তোমার হাতে খড়্গ দেবে তুলে।

(১৮২৭)

আরিঅন*

আমরা সবাই যাত্রী ছিলাম একটি নায়ে :
পাল তুলে কেউ দিয়েছিল — উড়ন্ত পাল,
বাইতেছিল দাঁড়গুলো কেউ — সামাল, সামাল,
ছুটছিল নাও বাতাস ঠেলে ডাইনে-বাঁয়ে।
মাঝি মোদের হাল ধরে সে ছিল বসে,
চালাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই নৌকা সোজা,
কেবল আমিই ধার ধারি নি কিচ্ছু বোঝার
গান গেয়েছি খুশির নেশায়... ঝড়ের ওঝা
হঠাৎ এসে দেয় ঝাঁকুনি প্রবল রোষে,
মত্ত সাগর গ্রাস করে নেয় নৌকা, মানুষ...
তলিয়ে যাই জলের নিচে — ছিল না হুঁশ,
কেবল প্রবল ঢেউগুলো মোর দেহ বয়ে
বালুবেলায় আছড়ে ফেলে দিল ফাঁকি...
এখন আমি রোদ্দুরে গা শুকাই. থাকি
সেই সেদিনের মোহন গানে মুখর হয়ে।

(১৮২৭)

কবি

যতক্ষণ কবিকর্ণে সঙ্গীতদেবতা
না-পাঠায় আত্মনিবেদনের আহ্বান,
কবি ততক্ষণ ক্ষুদ্র দৈনিকে সর্বদা
ডুবে থাকে, অতলে তলিয়ে থাকে প্রাণ।
ততক্ষণ নিরুচ্চার স্বপ্নপূত বীণা;
চিত্ত তার অবসন্ন আলস্যরভসে,
অযোগ্য সংসার তাকে ঘিরে রাখে কিনা,
তারো মধ্যে সম্ভবত অযোগ্যতম সে।

কিন্তু যবে একবার কর্ণে তার পশি'
বিচলিত করে তারে দেবতার বাণী —
তখন কবির চিত্ত ওঠে-যে উচ্ছ্বসি',
নভশ্চর ঈগল সে — জেগে ওঠে প্রাণী।
তখন সে সংসারের তুচ্ছ ছেলেখেলা
ফেলে রাখে, দূরে রাখে জন-কোলাহল;
মানে না সে মানুষের দেবতার মেলা,
সমুন্নতশির সে-যে, উদ্ধত প্রবল।
কবি তবে পলাতক — উন্মদ স্পর্ধিত,
প্রাণৈশ্বর্যে মত্ত, সুরে উদ্বেল সে নীত —
যেখানে নির্জনে সিন্ধুজলে সুমার্জিত
তটভূমি, অরণ্যানী রণিত ধ্বনিত।

(১৮২৭)

সুন্দরী, তুমি গেয়ো না মধুক্ষরা

সুন্দরী, তুমি গেয়ো না মধুক্ষরা*
সকরুণ গান জর্জিয়ার বারেক :
ওরা-যে কেবল আমারে মনে পড়ায়
আরেক জীবন, দূর তটভূমি এক।

সেই এক স্তেপ, রাত্রি, জ্যোৎস্নামায়া
ওই নিষ্ঠুর সুর মনে আনে খালি —
ভীরু কিশোরীর মূর্তিটি আবছায়া,
ভুলে-যাওয়া মুখ মনে জ্বালে দীপাবলি!

তোমাকে যখন দেখি : সে কোথাও নেই —
সে-ছায়ামূর্তি মোহিনী সর্বনাশী,*
কিন্তু যেমনি গান ধর : ছায়া সেই
গ্রাস করে মোর তনুমনপ্রাণ আসি'।

সুন্দরী, তুমি গেয়ো না মধুক্ষরা
সকরুণ গান জর্জিয়ার বারেক :
ওরা-যে কেবল আমারে মনে পড়ায়
সে-এক জীবন, দূর তটভূমি এক।

(১৮২৮)

আনচার*

দূর মরুদেশে — যেথা সূর্যের আলো সে-ও অভিশাপ —
সেথা আছে আনচার-সে বৃক্ষ, প্রহরী ভয়ঙ্কর,
একা মাথা তুলে আছে সে-ই ও-সে জগতে নিষ্পাদপ
ঊষর ধূসর নির্জনতার একক স্বয়ংবর।

জন্ম দিয়েছে ওকে বুকফাটা তৃষ্ণায় মরুমাটি,
মাথার উপরে করাল সূর্য রক্তচক্ষু — সেই-ই
অসহ ঘৃণায় এই বৃক্ষের শিকড়ে-কাণ্ডে খাঁটি
বিষের প্রবাহ দিয়েছে চারিয়ে, অহরহ দিচ্ছেই।

সেই হলাহল গাছের বাকল ভেদ করে উপচায়,
প্রখর দিনের আলো-উত্তাপে অ-দৃষ্ট, যায় গলে,
কিন্তু আঁধার ঘনালে সে-বিষ কঠিন গাঢ়তা পায়,
আর সারে-সার স্ফটিক-ফোঁটায় বৃক্ষ তখন ঝলে।

যত পাখি যত পশু সত্রাসে বৃক্ষকে দূরে রাখে।
কেবল সহজে ভয় পায় না যে সেই ঝোড়ো কালো হাওয়া
মাঝে-মাঝে ছুটে এসে পালাবার পথ পায় না কো — তাকে
তাড়া করে পিছে গরলবাষ্প ক্রোধে-বিদ্বেষে ছাওয়া।

ক্বচিৎ যদি-বা জলভরা মেঘ বর্ষে বৃক্ষশিরে,
অতিকায় যত বৃক্ষশাখারে দিয়ে যায় ধারাস্নান,
আর্দ্র বৃক্ষ বেয়ে তখন যে-জলধারা নামে ধীরে
স্বাদু জলও সেই হয়ে ওঠে ঘন গরলে পরিম্লান।

তবুও মানুষ পাঠাল মানুষে আন্‌চার-সন্ধানে--
একটিমাত্র ভ্রূর ইঙ্গিতে অভাগা সে-ক্রীতদাস
ছুটল অনেক দূরপথ ভেঙে, অবশেষে ও-যে আনে
পরদিন ভোর না-হতেই সেই গরল বিশ্বত্রাস।

প্রভুর সামনে এসে ক্রীতদাস নীরব বিনীতভরে
রাখল একটি তরুশাখা আর জমাট তরুক্ষার,
তখন ও তার কপোল বাহিয়া দরদরধারে ঝরে
হিমেল কৃষ্ণ ঘর্মের স্রোত, চক্ষে অন্ধকার।

গালিচার 'পরে দুর্বলভাবে এলিয়ে দিল সে দেহ,
পাণ্ডুবর্ণ মৃত্যুর ছায়া নামে মুখমণ্ডলে,
দীন ক্রীতদাস মারা গেল আর ফিরে দেখিল না কেহ —
লুটায়ে রহিল সর্বশক্তিমান রাজ-পদতলে।

আর নৃপতির নির্দেশে তাঁর অস্ত্রশালাটি জুড়ে
তীরমুখ বিষদিগ্ধ করে সে নিল দলবল সব,
রাজা তারপর রাজ্যসীমার বাহিরেতে কাছে-দূরে
পড়শী-রাজ্যে বাধিয়ে দিলেন মৃত্যু-মহোৎসব।

(১৮২৮)

জর্জিয়ার শৈলশিরে রাত্রি...*

জর্জিয়ার শৈলশিরে রাত্রি তার আঙরাখা বিছায়;
  আমারে শোনায় গান মৃদুকণ্ঠ নদী,
ধীরে — অতি ধীরে — শোক জড়ায়-যে, আলিঙ্গন দেয়
  শোক সে বিদ্যুৎ-দীপ্ত — কেন্দ্রে তার তুমি নিরবধি।
তুমি, শুধু তুমিই-যে মর্মে তার... দুঃখ-আবরণ
  আমারে রেখেছে ঢেকে পৃথিবীর কলকণ্ঠ হতে,
অন্তরে শুধুই মোর সংসারের প্রেমের দাহন,
  ভালোবাসা, পুড়ে মরা বিনা তার গতি কী জগতে!

(১৮২৯)

শীতের সকাল

তুষারে হিমে রৌদ্রালোকে দিনটা অপরূপ!
এখনও কেন ঘুমাও সখী... এখনও কেন চুপ...
সময় হল, ওঠো এবার, জাগো মিষ্টি মেয়ে!
মেলো-না চোখ — রুদ্ধ আঁখি সুখ-আবেশে অতি —
লজ্জা পাক উত্তরের দীপ্র মেরুজ্যোতি,
দাঁড়াও এসে সুমেরুকার তারার চোখে চেয়ে!

মনে কি পড়ে কাল রাতের তুষার-ঝড় খ্যাপা?
ঘোলাটে ঘোর আকাশ ছিল কুজ্ঝটিতে লেপা?
ফিকে একটা অচিন ছোপ — হলুদ-রঙা সে কি
চাঁদই ছিল, সুগম্ভীর মেঘে যে উঁকি দিলে?
তুমি-যে বড় মলিন মুখে তখন বসে ছিলে —
আর এখন?.. জানলা দিয়ে বাইরে দ্যাখো দেখি:

আকাশ দ্যাখো স্বচ্ছ নীল, আদিগন্ত মাটি
উপরে তার রৌদ্রঝলা তুষার পরিপাটি
বিছনো — যেন চমৎকার গালিচা মনোলোভা,
রিক্তপাতা বনভূমির মুখটি শুধু কালো,
হিমমুকুট ফার্‌গুলিতে খেলে সবুজ আলো,
বরফঢাকা নদীটা দূরে ঝিলিক-দেয়া শোভা।

স্ফটিক-পীত আলোয় গোটা ঘর উদ্‌ভাসিত,
খুশির কাঠপোড়ানি-গানে চুল্লি মুখরিত,
লাগছে বেশ কেদারা টেনে আগুনতাতে বসে
নানান কথা ভাবতে... নাকি, হয় কেমন যদি
জুততে বলি স্লেজে এখন ঘোর বাদামি মাদী
ঘোড়াটাকেই — জমাই পাড়ি দু'চার ক্রোশ কষে?

ভোরের এই তুষার ছেনে দূর-দূরান্তরে
চল ছোটাই ঘোড়া, দিই-না রাশ আল্‌গা করে,
চলার বেগে সখী তোমার মনটা সঁপে দিয়ো --
আমরা শুধু দেখব ধু-ধু প্রান্তরের ছুট,
শূন্য বন — আছিল যার ঘন পত্রপুট —
চল যাই সে-নদীর তীর মোর প্রাণের প্রিয়।

(১৮২৯)

তোমারে বেসেছি ভালো...

তোমারে বেসেছি ভালো, হয়ত এখনো
এ-বুকে তা নির্বাপিত নয় একেবারে;
সেটা যেন উদ্বেজন না ঘটায় কোনো,
কিছুতেই কষ্ট দিতে চাই নে তোমারে।
নীরব সে ভালোবাসা আশাও না রেখে,
ভুগেছি ভীরুতা আর কভু-বা ঈর্ষায় —
এত অকপটে, এত স্নেহ দিয়ে ঢেকে
অন্য কোনোজন ভালোবাসুক তোমায়।

(১৮২৯)

যেখানেই থাকি আমি...

যেখানেই থাকি আমি — ঘুরে ফিরি রাস্তায়-রাস্তায়
ঢুকি ভিড়াক্রান্ত গির্জাঘরে, কিংবা করি রাত্রিবাস
উদ্দাম সঙ্গীর দলে — কিছুতে কিছু না এসে-যায়,
সর্বত্রই একটি চিন্তা শাসায়-যে মনের আকাশ।

চিন্তাটা আমার এই: দিন চলে যাচ্ছে বড় দ্রুত,
আমরা এখানে যারা সমবেত — সকলেই তারা
করাল মৃত্যুর হাতে অচিরেই হব উপদ্রুত,
কে জানে এখনই হয়তো কারো কানে বিদায়-নাকাড়া।

সুপ্রাচীন ওকবৃক্ষ — তারও পানে চেয়ে আতঙ্কিত
বলি চুপিচুপি: 'আমি যখন থাকব না তখনও এ
বনবীথি আলো করে থেকে যাবে জানি সুনিশ্চিত,
মোর পিতৃপুরুষেরা চলে গেছে — বৃক্ষ গেছে রয়ে!'

যখন শিশুর সাথে খেলা করি, গুন্‌গুনিয়ে বলি:
'বিদায়!.. রে বন্ধু, তোরে স্থান ছেড়ে দিই... গুরুগুরু
যাত্রাকাল ঘনিয়েছে — আয়ু মোর ফুরাল-যে — চলি!
আমি হব কীটভোগ্য, পুষ্পিত জীবন তোর শুরু।'

দিনে দিনে দিন যায়, বছরও ফুরায় ক্ষণস্থায়ী,
গভীর নীরবে আমি দেখি তারা তলায় অতলে,
আর ধৈর্যহারা ভাবি (বৃথা ভাবি!) কখন বিদায়ী
মুহূর্ত ঘনাবে মোর, আমারেও যেতে হবে চলে।

মৃত্যু কি আমারে গ্রাস করবে মহা-সমরাগ্নি জেবলে?
সমুদ্রযাত্রায় নাকি ডেকে নেবে ঢেউয়ের জঠরে?
অথবা আশপাশে কোনো উপত্যকা দুটি বাহু মেলে
হিম-অবশেষ মোর দেবে ঢেকে নিভৃত কবরে?

কোথায় শয়ানে হব অনন্ত নিদ্রায় — সে-কথার
অর্থ কিবা, দেহ যবে প্রাণহীন, মৃত্তিকায় লীন?
কেবল এটুকু জানি, পাব বিশ্রামের অধিকার
মাতৃসম ভূমিগর্ভে...
শুধু জানি, দিন পরে দিন

মোর সমাধির 'পরে এ-জীবন সুচিরযৌবন
অজস্র ঝর্ঝরধারে বয়ে যাবে নির্ঝর-সমান,
এবং প্রকৃতি তার স্বপ্নময় আভা বিকিরণ
করে যাবে রূপবতী, সুখে-দুঃখে নির্বিকার-প্রাণ।

(১৮২৯)

ককেশাস*

আমার নিচে শয়ান ককেশাস, উপরে একা
দাঁড়িয়ে আছি তুষারে, পাশে নদী খরস্রোতা,
কোন-সে দূর পাহাড়চূড়া ছেড়ে সামনে হোথা
একাকী এক ঈগল স্থির — বাতাসে মেলে পাখা।
এখান থেকে জন্ম নেয় নদী কলস্বর,
প্রথম ধস এখান থেকে নামে ভয়ঙ্কর।

পায়ের নিচে কৃষ্ণ মেঘ চলেছে গুটিগুটি,
মেঘ-সে চিরে ঝাঁপায় ঝোরা, গর্জমান জল,
তাহার নিচে নগ্ন গিরিচূড়া জগদ্দল,
নিচেতে তার শ্যাওলা, শুখো ঝোপ রয়েছে জুটি'।
এর পরেতে তরুকুঞ্জ, ঘাসের শ্যামলিমা,
পাখিরা ডাকে, হরিণ চরে, সুখের নেই সীমা।

তা-রও নিচে পাহাড়ে বাসা বেঁধেছে মানুষেরা,
শস্যস্রোতে ঢলে পাহাড়, চরে ভেড়ার পাল,
চারণভূমি নামে উপত্যকায় বেয়ে ঢাল,
ফুল্ল যেথা আরাগ্‌ভার স্রোতটি ছায়াঘেরা।
নিঃস্ব এক ঘোড়সওয়ার লুকায় খাদভিতে,
তেরেক সেথা খেলে বেড়ায় অসহ স্ফূর্তিতে।

সগর্জনে খেলে সে যেন জোয়ান জানোয়ার,
লোহার খাঁচা থেকে মাংসটুকরো দেখে ও-সে
বুঝি ঝাপট মারছে তীরে বিফল আক্রোশে,
ক্ষুৎকাতর ঢেউয়ের জিভে লেহন করে পাড়…
হায় রে হায়, নেই-যে তার খাদ্য, নেই সুখ:
নিয়ত তারে পেষণ করে জগদ্দল মূক।

(১৮২৯)

দু'বাহুবেষ্টনে যবে...

দু'বাহুবেষ্টনে যবে তোমার চিকণ দেহখানি*
আলিঙ্গনে ধরি ধৃষ্ট কোমলতা দুর্বলতাভ্রমে,
যখন তোমার কানে মোহাবেশে সানন্দে বাখানি'
প্রবল উদ্দাম উষ্ণ প্রেমকথা — তুমি ধীরে ক্রমে
নিজেকে করেছ মুক্ত আমার দুর্বার বাহু থেকে
নিঃশব্দে অলক্ষ্যে, আর বুঝি এক মুহূর্তের তরে
অস্ফুট হাসির ঢেউ ঠোঁটের দু'কূলে গেছ রেখে —
ক্ষীণ, দূরপরাহত, কী-যে এক অবিশ্বাসভরে।
তোমার মনের কোণে সযত্নে সঞ্চিত জানি ও-সে
কল্পিত মিলন নিয়ে যত গুপ্তকথার গুজব —
আমি যত বলি, তুমি কানেও তোল না সেইসব,
আমি কৈফিয়ত দিই, ভাবলেশহীন থাক বসে।...
কী-যে অভিশাপ আমি দিই মোর ভ্রষ্ট যৌবনের
মধুর বিভ্রম আর সুখ-সন্ধানেরে, কিবা বলি! —
প্রেমের প্রত্যাশী রাত্রি-অন্ধকারে বাগান-পথের
কিংবা কুঞ্জকোণে সেই অভিসার, মিলন-কাকলি,
কানে-কানে সেই কাব্যপাঠ, যার শব্দে উন্মাদনা
জাগত রক্তে, গোড়াতেই সোহাগচুম্বনসুধা সেই
সহজবিশ্বাস-বশে মেয়েরা যা দিত আমাকেই,
আর সেই বিলম্বে উদ্বেল অনুতাপ-বিড়ম্বনা!
(১৮৩০)

গাব্রিইল দেরজাভিন (১৭৪৩-১৮১৬), শ্রুতকীর্তি রুশ কবি। জীবন সায়াহ্নে তিনি রুশ কবিতার উদীয়মান তারকা বলে পুশকিনকে অভিবাদন জানান। বরোভিকোভস্কি কৃত পোরট্রেট, ১৮১১

১৮১৫ সালে লাইসিয়ামের প্রকাশ্য পরীক্ষায় দেরজাভিনের উপস্থিতিতে পুশকিনের স্বরচিত কবিতা পাঠ। রেপিন অঙ্কিত চিত্র, ১৮১১
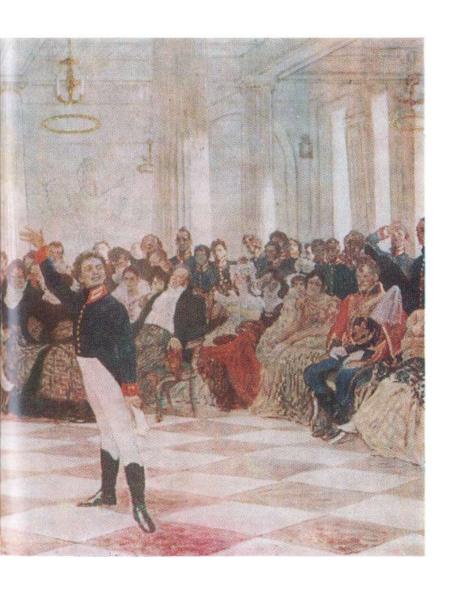
কনস্তান্তিন বাতিউশ্‌কভ (১৭৮৭-১৮৫৫), খ্যাতনামা রুশ কবি। এনগ্রেভিঙ, ১৮২১

আমার নামে কাম কী তোমার?..

আমার নামে কাম কী তোমার?.. নাম তো যাবে মরে
যেমন সন্দূর তীরে ঢেউয়ের ঝলক
তোলে করুণ ধ্বনির মৃদু ছলক,
রাত্রে যেমন গহন বনের দীর্ঘশ্বাস ঝরে।

স্মরণ-খাতার হলুদ-হয়ে-আসা একটি পাতে
রাখবে সে নাম চিহ্ন মলিন চিকণ,
কবরফলক রাখে যেমন লিখন,
ভুলে-যাওয়া ভোলাতে চায় দুর্বোধ চেষ্টাতে।

নামে তোমার কাম কী? সে তো কবেই ভুলে আছ
নিত্য-নতুন মন্থনে মন বিবশ,
নাম তো আমার দেবে না তায় যতই তুমি যাচ
অমল কোমল করুণ স্মৃতির পরশ।

কিন্তু যেদিন দুঃখ আনবে অতল মৌন, তবে
স্মরণ কোরো আমায় তীব্র ব্যথায়,
বোলো: 'আমায় ভোলে নি সে — ভবে
একটি হৃদয় আছে, আমি ঠাঁই পেয়েছি তথায়।'

(১৮৩০)

বিনিদ্র রাত

ঘুম আসে না কো, রাত নিরালোক যাপে,
অশান্ত ঘুম, ব্যাপ্ত অন্ধকার,
টিক্‌টিক-স্বর শিয়রে-যে বারবার,
নাছোড়বান্দা ঘড়ি কি রাত্রি মাপে!
নিয়তি — সে তিন বৃদ্ধার উচ্ছ্বাস,
ঘুমন্ত রাত শিহরিত, ফেলে শ্বাস,
জীবন-ইঁদুর খালি ইতিউতি ঘোরে...
কেন রে জ্বালাস বল্‌ তো এমন করে?
ক্লান্তিকর এ কানাকানি — অর্থ কী?
ব্যয়িত আমার দিনগুলি ব্যর্থ কী —
তাই অনুযোগ? তাই দোষারোপ মোরে?
কী খুঁজিস তুই বল্‌-না আমার কাছে?
কোনো ভবিষ্য-বাণী কি বলার আছে?
কান পেতে শুনি আশ্রয় করে ভুঁই:
এ কোন সন্ধ্যাভাষায় বকিস তুই!

(১৮৩০)

পিশাচেরা

ঘুরঘুর ঝোড়ো মেঘ, দুদ্দাড় ঝোড়ো মেঘ,
আবছায়া দূরাকাশ, আবছা এ-রাত্রি,
ফাঁকে তার চোরা চাঁদ কটাক্ষে চায় আর
ঝল্‌সায় তুষার-সে উড়ন্ত যাত্রী।
ছুটে চলি আমরাও... ধূ-ধূ মাঠ সীমাহীন,
পাহাড় ও প্রান্তর পিছে পিছ্‌লাচ্ছে।
আতঙ্কে বিহ্বল স্লেজে আমি নিশ্চল...
রুন্‌ঝুন-রুন্‌ঝুন ঘুণ্টিরা বাজছে।

'কোচোয়ান, জাগো হে! ব্যাপার কী...' 'ও হুজুর,
ঘোড়াগুলা হাঁপাচ্চে, যাচ্চে না জল্‌দি,
আর মুই জেরবার, পেরায়-যে অন্ধ,
সবই শালা হাওয়া আর বরফের ফন্দি!
সামনে তো রাস্তার দিশাটুক নাই আর,
পথ ভুল হয়ে গ্যাচে... কী-যে করি, কিমতে?
পিচাশের পাল্লায় পড়া গ্যাচে — মোদেরে
নাকে দড়ি দে' সে লিয়ে যাচ্চে-যে বিপথে।

'দ্যাখেন, কেমন ও-সে নাফঝাঁপ জুড়েচে,
থুক দেয় ফুঁক দেয়, মেজাজটা খাপ্পা,
মন্দা এ-ঘোড়াটারে ঠেলচে তো ঠেলচেই
খাদে ফেলবার লেগে হেসে দেয় ধাপ্পা।

এখুনি সে বনে যাবে রাস্তার খাম্বা,
পথ আটকাবে এসে, ফের হবে আলেয়া,
দপ্‌দপ জ্বলে-জ্বলে ফুস করে ঝটপট
আঁধারে পগার-পার হয়ে যাবে ও-দেয়া।'

ঘুরঘুর ঝোড়ো মেঘ, দুদ্দাড় ঝোড়ো মেঘ,
আবছায়া দূরাকাশ, আবছা এ-রাত্রি,
ফাঁকে তার চোরা চাঁদ কটাক্ষে চায় আর
ঝল্‌সায় তুষার-সে উড়ন্ত যাত্রী।
একই পথে পাক খেয়ে ঘোড়াগুলো থমকায়
থেমে যায় অবসাদে... থেমে যায় ঘণ্টি।
'কী দেখে থামল ঘোড়া — খাম্বা, না নেকড়ে?'
'হুজুর, ঠাহর ঠিক পাচ্চি নে কোনটি।'

তুষার-ঝঞ্ঝা কাঁদে, মহারোষে গর্জায়,
আতঙ্কে চিঁহি-চিঁহি ডাকে ঘোড়া এধারে,
মাঠ-প্রান্তর জুড়ে পিশাচটা তড়্‌পায়,
দুটো চোখ ধকধক করে তার আঁধারে।
হঠাৎ ঘোড়ারা ভয়ে কেঁপে ওঠে থত্থর,
ছোটে প্রাণপণে, বাজে ঘণ্টির ছন্দ...
দেখি, কোত্থেকে জুটে অসংখ্য দলবল
ঘিরে ধরে আমাদেরে পিশাচ কবন্ধ।

গা-ছম্‌ছম সেই ভৌতিক জ্যোৎস্নায়
বেয়াকুল কাঁদে তারা, ডাকে-যে দিগন্তে,
ঘুরে ঘুরে লাফ দিয়ে নাচে পাগলের প্রায়,
ঝরাপাতা নাচে যথা হাওয়ায় হেমন্তে।
কেন এত অস্থির, কেন ওরা উন্মাদ?

কেন হেন ভৌতিক শব্দ-তরঙ্গ?
এই কি তাহলে প্রেত-বিবাহের উৎসব?
নাকি এ ডাকিনীদের পৈশাচ রঙ্গ?

ঘুরঘুর ঝোড়ো মেঘ, দুদ্দাড় ঝোড়ো মেঘ,
আবছায়া দূরাকাশ, আবছা এ-রাত্রি,
ফাঁকে তার চোরা চাঁদ কটাক্ষে চায় আর
ঝল্সায় তুষার-সে উড়ন্ত যাত্রী।
ঘুরে-ঘুরে পিশাচেরা উঠে যায় আকাশেই
দেহ ঢেকে তুষারের কাফনেতে সূক্ষ্ম,
ওদের বিলাপ আর বীভৎস চিৎকার
আমার হৃদয়ে হানে আতঙ্ক, দুঃখ।

(১৮৩০)

বিষাদসঙ্গীত

সুরারে উৎসবশেষ যেমন সে-বিষণ্ণ খোয়ারি,
প্রলাপী দিনের মৃত মুখরতা তেমনই করুণ,
বয়ঃক্রমে যথা বাড়ে মত্ততার ক্রিয়া — মতো তারই
ক্রমশ দুর্ভার লাগে গত দিন, হা রে অ-তরুণ!
যাত্রাপথ আবছায়া, ভবিষ্যৎ সমুদ্রঊর্মিল
পুঞ্জীভূত শ্রম, শোকই বিধিলিপি — আভাসে জানায়।

হে বন্ধু, তবুও আমি ছাড়িবারে চাহি না নিখিল!
চাহি আয়ু, আরো আয়ু, আরো স্বপ্ন, আরো বেদনায়!
দুশ্চিন্তার আতঙ্কের দুঃখের কেন্দ্রেই কী অগাধ
সুখ, আছে সুখ — জানি, পাব আমি সে-সুখের স্বাদ!
আবার মাতাল হব পান করি' দিব্য সুরনদী,
স্বকপোলকল্পনায় বিচলিব, অশ্রু নামে যদি।
অকস্মাৎ যেইদিন শেষ ঘণ্টা ঘনাবে সকাশ,
বিদায়মুহূর্তে মৃদু হেসে প্রেম রাঙাবে আকাশ।

(১৮৩০)

প্রতিধ্বনি

বজ্র যখন ঘা দেয় সঘন ডঙ্কায়,
অরণ্যে ডাকে জন্তুরা রোষে শঙ্কায়,
শিঙার নিনাদ, কুমারীর গান ঝন্‌কায় —
শূন্যকে দিয়ে নাড়া
তখন প্রতিটি শব্দে সপাটে চমকায়
তোমার স্পষ্ট সাড়া।

তুমি শোনো যবে বজ্র দমকে দুর্বার,
গর্জে ঝঞ্ঝা, শিলা খসে পড়ে দুদ্দাড়,
রাখাল যখন পশুপালে ডাকে বারবার
তুমি সাড়া দাও জোর,
জবাব মেলে না... ভাগ্য এমনই জেরবার —
হে কবি-বন্ধু মোর!

(১৮৩১)

হেমন্ত

(অংশ)

অতঃপর স্বপ্ন-অক্ষৌহিণী
ঘুমন্ত মস্তিষ্কে দেয় হানা...

— দের্‌জাভিন

॥ ১ ॥

এল অক্টোবর মাস; কুঞ্জবন অক্লেশে খসায়
শেষ ক'টি সোনারঙ শুষ্ক পাতা রিক্ত শাখা থেকে;
ময়দা-কল 'পার ছোট নদীটি এখনও বেগে ধায়,
যদিও তড়াগ ও পথ তুষারিত, বায়ু হিম মেখে;
আমার পড়শী যায় শিকারের খোঁজে, নির্বাধায়
ছোটে তেজীয়ান ঘোড়া, ঘনঘন শিঙা যায় হেঁকে,
দুর্মদ খেলায় সেই দূরের প্রান্তর অনামন,
গম্ভীর কুকুর ডাকে, ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে বন।

॥ ২ ॥

হেমন্ত আমার প্রিয়; বসন্তে বিহ্বল মন মোর;
গলিত তুষার ক্লিষ্ট করে বড়, বিকল ইন্দ্রিয়,
শিরায় জ্বরের ঢেউ… কর্দমে ও কটুগন্ধে ভোর…
ধীরে বিষণ্ণতা নামে মনে… বরং আমাকে দিয়ো
সঞ্জীবনী শীত, সেই শ্লেজযাত্রা তুষারে অঘোর,
প্রিয়তমা দেহলগ্না, কম্পিত আঙুলে রমণীয়
পশ্‌মি পোশাকের নিচে খুঁজে ফেরে আমার আঙুল,
সেই সুখস্পর্শটুকু একান্ত আমারই — সে কি ভুল?

॥ ৩ ॥

ইস্পাতফলক-পায়ে স্ফটিক-নদীটি পিছ্‌লে যাওয়া —
শীতভোরে কোন খেলা এর চেয়ে বল সুখকর!
কিংবা ধর শীতের উৎসব — আলোঝলা, খুশি-ছাওয়া
কী-যে উন্মাদনা সেই! তবু, বন্ধু, মানো অতঃপর,
ঘুমন্ত ভল্লুক তারও অসহ্য এমন নিশি-পাওয়া
অর্ধেক বছর যাপা চাপা পড়ে তুষার-কবর।
প্রমোদভ্রমণে স্লেজে, কিংবা চুল্লিপাশে অন্তহীন
জীবন চলবেই — হেন সুখ-আশ আজ শূন্যে লীন।

॥ ৪ ॥

রে শোভন গ্রীষ্ম! তোরে ভালোবাসি খুবই, তবে কিনা
উত্তাপ, ধুলোর মেঘ, ডাঁশমশা, মাছি চতুর্দিক
ছেঁকে ধরে এই দোষ… তৃষ্ণায় মরি-যে জল বিনা

মৃত্তিকার মতো... চেতনা আচ্ছন্ন, দেহ নির্নিমিখ
খোঁজে ঠাণ্ডা জল, ছায়া — অন্য কিছু ভাবতেই পারি না,
তাই দুঃখ পাই শীত মরে যবে সুধীরে, সঠিক।
বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টি করি সরুচাকলি-ভোজে আমাদের,
বরফ-পানীয়ে তারে পুনরুজ্জীবনে ডাকি ফের।

॥ ৫ ॥

শেষ-হেমন্তের দিন অনেকেরই অপছন্দ জানি,
পাঠক, তবুও আমি মন্ত্রমুগ্ধ সৌন্দর্যে তাহার
কোমল, করুণ... নেই মহত্তর ঋতু; ঋতুরানী
সে-ই সকলের সেরা। পরিত্যক্ত শিশুটি আমার
আদর যেমন কাড়ে, সেইমতো। না বন্ধু, বাখানি
চাটুবাক্য নয় — সত্য, মুক্ত হয় মোর মোহদ্বার
হেমন্তের স্নিগ্ধ রূপে। নই দম্ভী, অসার প্রেমিক,
ওর সে-রূপের যাদু নয় খোশখেয়ালও সঠিক।

॥ ৬ ॥

ওকে আমি ভালোবাসি — (উপমায় বলি!) যথা কেহ
ভালোবাসে ক্ষয়রোগী কুমারীকে — যে জানে জীবন
ফুরাবে সহসা, তবু বিনা হা-হুতাশে সঁপে দেহ
মৃত্যুর খড়্গের নিচে... হাসিমুখে... ফেরায় নয়ন
মৃত্যু হতে, যদিও শমন-জিহ্বা করাল লেলিহ
সর্বদা সম্মুখে, তবু কাছে ঘেঁষতে পারে সে-মরণ
অদৃশ্য চোরের মতো... আরক্তিম মুখ নিয়ে তার
মেয়েটি আজকেও আছে, হয়তো কাল থাকবে না কো আর।

॥ ৭ ॥

রে বিষণ্ণ নিরানন্দ কাল, চোখে তৃপ্তি মনে সুখ
দিস তুই ভরে; তোর স্খলিত সৌন্দর্য অপরূপা,
প্রকৃতি বিদায়ক্ষণে রঙে-রসে-ঐশ্বর্যে উন্মুখ,
বন সাজে স্বর্ণবর্ণে, বায়ু শ্বসে জীবন-স্বরূপা,
নীলাকাশ মেখে নেয় ধূসর মৌক্তিকে তার বুক,
প্রথম হিমেল স্পর্শ, রৌদ্রে দ্বিধা, ক্ষণে ছায়াধূপা
পৃথিবী সূর্যের আশে উন্মনা, পলিতকেশ শীত
শাসায়, তবু সে দূরে, এখনও অস্পষ্ট তার রীত্।

॥ ৮ ॥

সদয় হেমন্ত এলে খুশিতে ছলকায় মোর মন,
যেন প্রাণ পাই পুনর্বার... ভারি মিষ্টি, উপকারী
আমাদের রুশী ঠাণ্ডা, বন্ধুরা জানো তো? অনুক্ষণ
হাঁটি না তো, উড়ে চলি; ক্ষুধা, ঘুম বৃদ্ধি পায় ভারি;
দৈনিক জীবনে হয় নব আনন্দের উদ্বোধন;
বাসনা টগবগ ফোটে... হই ফের যুবা স্বেচ্ছাচারী।
এমনই আমার ধারা, হে পাঠক, তাই বলিলাম
আটপৌরে কথা ক'টি, ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে রাখিলাম।

॥ ৯ ॥

সহিস এনেছে ঘোড়া, ছোটাই ঘোড়ারে দ্রুতগতি,
নিঃসীম পতিত জমি, মুক্ত মাঠ ছেড়ে উড়ে যাই।
ঘোড়ার খুরের ঘায়ে বাজে মাটি ঝন্‌ঝন অতি,

চিড় ধরে হেথা-হোথা... দেখতে-দেখতে আলো আর নাই,
দিন পড়ে আসে; চুল্লিতে আগুন জ্বলে, নামে যতি
ভ্রমণেই, সুখকর উষ্ণতায় নিজেকে হারাই
আগুনের ধারে বসে — দেখি অগ্নিশিখা নাচে-গায়,
বই হাতে বসে থাকি কিংবা ডুবি দূরের ভাবনায়।

॥ ১০ ॥

তখন জগৎ ভুলি, মধুর নৈঃশব্দ্যে অন্যমনা
আমারে জড়ায় ধীরে মোহময় কল্পনার জাল,
অন্তরে আমার জাগে কাব্য আর চিত্তে কলম্বনা
উত্তাল সুরের স্রোত জুড়ে দেয় আথালপাথাল,
আত্মায় কাঁপন লাগে, গান জাগে, খোঁজে সুরঞ্জনা
মুক্তধারা, ঝরে শব্দ বাঁধভাঙা... আসে শুভকাল
দলে-দলে অতিথিরা আসে দোরে, জানায় আহ্বান;
পুরানো বন্ধুরা মোর, মস্তিষ্কের মোহন সন্তান।

॥ ১১ ॥

চিন্তারা জমায় ভিড়, নাচে তারা উচ্ছল, মনোজ,
অমনি ছুটে আসে ছন্দ-মিল, আঙুল অস্থির হয়ে
খোঁজ করে স্বপ্নস্রাবী কলমের, কলম — কাগজ...
একটিই মুহূর্ত, আর কবিতার ধারা যায় বয়ে।
অমনই ঝিমায় তরী, যতক্ষণ পড়ে না কো খোঁজ
দ্রুত ও নিপুণ দুটো হাতের; জীয়নকাঠি লয়ে
যেই তারা ছুঁয়ে দেয় অমনি পাল মেলে দেয় পাখ্,
যাত্রা শুরু করে তরী — ঢেউ ভেঙে ছোটে সে বেবাক।

॥ ১২ ॥

তরী ধায়... আমরা কোথা যাই কোন সাগরের পার?

(১৮৩৩)

সময় হয়েছে, বন্ধু!

সময় হয়েছে বন্ধু, সময় হয়েছে! শান্তি চায়-যে হৃদয়:
দিন পরে দিন যায়, ঢেউ ভাঙে দণ্ডপল প্রবল, দুর্জয়
চূর্ণ ক'রে অস্তিত্বের তটভূমি — তুমি-আমি তবু ভাবি মনে
বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব, আর দ্যাখো তিলে-তিলে মরি-যে দু'জনে।
এ-জগতে সুখ নেই, তবু কিন্তু আছে শান্তি, স্বাধীনতা আছে,
দেবভোগ্য ভবিষ্যৎ বহুকাল স্বপ্ন হয়ে মনে মোর বাঁচে —
শ্রমতিক্ত ক্রীতদাস বহুকাল অভিসন্ধি রাখি পালাবার
সে-আলয়ে — যেথা আছে শুদ্ধ শ্রম, শুচি সুখ, আনন্দ অপার।

(১৮৩৪)

ঝড়ের মেঘ

রে মেঘ, ঝড়ের মেঘ, ঝঞ্ঝা-অবশেষ, তুই কেন একা-একা
এমন উন্মাদসম ছুটেছিস শূন্যে এঁকে মসীকৃষ্ণ রেখা?
যাচ্ছিস, চলেই যা-না — কেন তবু ছুড়ে দিস হিংসুক বেহায়া
উচ্ছল দিনের মুখে এক-টুকরো অন্ধকার থমথমে ছায়া?

এই কিছুক্ষণ আগে ছিলি তুই থরেথরে আকাশ সাজিয়ে,
বিদ্যুতের বড়-বড় বর্শা যত ইতস্তত ছুড়ে-ছুড়ে দিয়ে,
বজ্রের গর্জনে হিংস্র দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে ক্ষণে-ক্ষণে —
তবু ধন্য করেছিস অরণ্য-প্রান্তর-পৃথ্বী অজস্র বর্ষণে।

যথেষ্ট হয়েছে! এবে কর্ ত্বরা! প্রতীক্ষা কিসের?.. চলে যা রে!
পৃথিবী তো স্নানস্নিগ্ধ, বৃষ্টিঝড়ও পলাতক, তবে চাস কারে?
বাতাসও বল্গায় বাঁধা, পোষমানা, তবু দ্যাখ্ প্রাণপণে সে-যে
উজ্জ্বল আকাশ থেকে তোরে দূর করে দিতে কোমর বেঁধেছে।

(১৮৩৫)

চিন্তায় বিমনা যবে...

চিন্তায় বিমনা যবে শহর ছাড়িয়ে পায়ে-পায়ে
কবরখানায় যাই সর্বসাধারণের — সে-ঠাঁইয়ে
দেখি সারে-সার বেড়া, স্মৃতিস্তম্ভ, কবরফলক,
নিচে যার শহরের মৃত মানুষেরা অপলক।
নরম মাটির নিচে পাশাপাশি ওরা ঘেঁষাঘেঁষি —
প্রলুব্ধ কাঙালি যেন, ভোজে যার খাদ্য নেই বেশি।
পদস্থ ও ধনী যারা তাদের সমাধি লজ্জা মানে
তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী-মিস্ত্রিদের কুৎসিত নির্মাণে,
সমাধিফলকে গদ্যে-পদ্যে যত উৎকীর্ণ লেখন
মৃতদের গুণ-কর্ম-পদ করে সগর্বে বর্ণন,
প্রতারিত মুগ্ধ স্বামী — তারও জন্যে শোকার্ত মদন,
ভস্মাধার-অপহৃত স্তম্ভ, অবহেলিত বিজন
খনিত কবর দেখি হেথা-হোথা জৃম্ভণে নিরত,
কাল ভোরে ভাড়াটিয়া আসবে, আছে প্রতীক্ষায় যত —
দেখি আর মানুষের মূর্খতায় বিচলিত হই,
বিষাদে ও মনোকষ্টে হয়ে পড়ি অস্থির বড়ই,
পালাতে চাই-যে ছুটে...
তবু আমি কত ভালোবাসি
হেমন্তসন্ধ্যায় যবে মাথার উপরে নীলাকাশই
গভীর নিঃশব্দে মৃত মানুষের মতো ঘুম যায়
তখন বেড়াতে ঘুরে পিতৃপুরুষের স্তব্ধতায়
মোদের গরিব গাঁয়ে কবরখানায়। সারি-সারি

পিওতর চাদায়েভ (১৭৯৪-১৮৫৬), কবি ও দার্শনিক। পুশকিনের বিশ্বদীক্ষা গঠনে এ'র প্রভাব প্রভূত। মলিনারি কৃত পোরট্রেট, ১৮১০-এর দশক
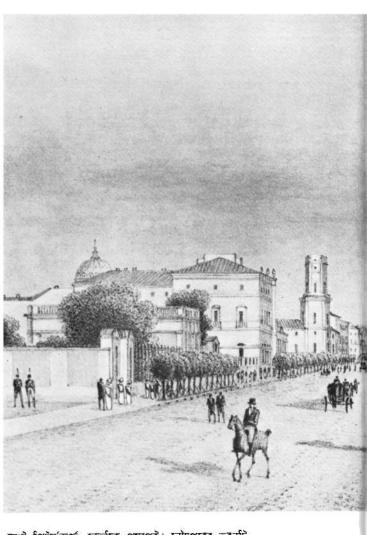
সেণ্ট পিটর্সবুর্গ, নেভ্‌স্কি প্রসপেক্ট। নৌদপ্তরের ভবনটি দেখা যাচ্ছে। লিথোগ্রাফ, ১৮২০-এর দশক
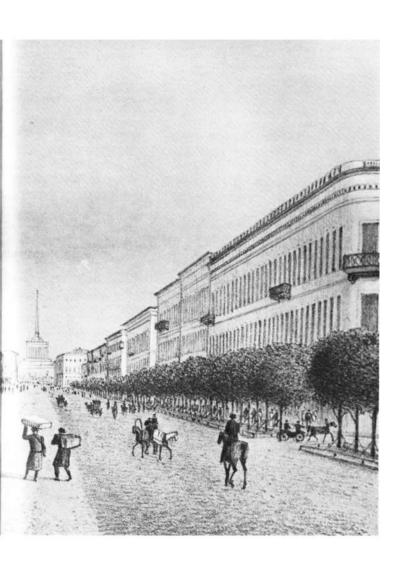
ভাসিলি জ্কোভ্স্কি (১৭৮৩-১৮৫২), প্শকিনের সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ কবি ও স্হৃদ। ১৮২০ সালে তিনি প্শকিনকে নিজের একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন, তাতে লেখা ছিল 'পরাজিত গ্র্র কাছ থেকে বিজয়ী ছাত্রকে'। লিথোগ্রাফ, ১৮২০

শাদাসিধা পাথরফলক আছে সেথা, চোর তারই
উঞ্ছবৃত্তি চরিতার্থ করতে সেথা পশে না রাত্তিরে,
সৎ গ্রামবাসী শুধু পথে যেতে ক্ষণতরে ফিরে
গুন্‌গুন প্রার্থনা আর দীর্ঘশ্বাস রেখে যায় চলে।
সে বড় প্রাচীন ঠাঁই — দরিদ্র, শৈবাল-শোভা কোলে,
ভস্মাধার নাই সেথা, কর্তিতনাসিকা কলাদেবী-
শোভিত স্মরণস্তম্ভ, কিছু নাই, অর্থী বা হিসেবি,
শুধু এক ওকবৃক্ষ প্রাচীন সমাধিভূমি 'পরে
ছায়াছত্র মেলে থাকে, কথা কয় পল্লবমর্মরে...।

(১৮৩৬)

অলৌকিক স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছি আমার

Exegi monumentum*

অলৌকিক স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছি আমার,
যার পানে হাঁটাপথ ছাইবে না কো ঘাসে,
আলেক্‌সান্দরী থাম* নতশির তার
অনবদমিত শীর্ষপাশে।

সবটাই যাব না মরে, সাধের বীণায়
রবে প্রাণ যবে মরদেহ হবে ছার,
রবে খ্যাতি যতদিন এই চাঁদিনায়
রবে একজনও শ্লোককার।

মোরে নিয়ে কথা মহা-রাশিয়ায় শুনো,
নাম ধরে দেবে ডাক দিক হতে দিক
দৃপ্ত স্লাভপৌত্র, ফিন, তুনগুজ বুনো,
স্তেপের বঁধুয়া কাল্‌মিক।

মোর অনুরাগী রবে বহুকাল লোকে,
জাগিয়েছি শুভবোধ বীণায়, কেননা
গেয়েছি মুক্তির জয় নিষ্ঠুর শতকে,
নিপতিতে মেগেছি বেদনা।

কলালক্ষ্মী, শোনো শোনো, আজ্ঞা দেবতার,
সর্বনাশে নেই ভয়, বরমাল্য-পিছে
ছুটো নাকো, থেকো নিন্দা-যশে নির্বিকার,
নির্বোধের সঙ্গে তর্ক মিছে।

(১৮৩৬)

কাহিনী

বেদেরা*

বেদেরা বেড়ায় ঘুরে হেথা-হোথা বেসারাবিয়ায়
দলে-দলে, হল্লা করে... কখনও-বা নদীর কিনারে
সারে-সারে ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবু গেড়ে সংসার সাজায়,
হিম রাত্রিবায়ু থেকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা সারে।
খোলা আকাশের নিচে শান্তিতে সকলে ঘুম যায়,
উদার মুক্তির মতো সুখময় বিশ্রাম রাতের;
সার-সার ঠেলাগাড়ি — নিচে তার উৎফুল্ল লাফায়
চাকার আড়ালে অগ্নিশিখা, ঝোলে জাজিমের ঘের;
একটি-একটি পরিবার অগ্নিকুণ্ড ঘিরে থাকে বসে,
রাতের রান্নার কাজ চলে; কাছে চরে ফেরে মাঠে
ছাড়া-পাওয়া ঘোড়া গুটিকয়; পোষা ভালুক আলসে
গড়ায় তাঁবুর পাশে। সন্ধ্যাও গড়ায়, রাত্রি হাঁটে...
প্রাণ পায় স্তেপভূমি, সারা রাত্রি জাগে সে উৎসুক:
বেদেদের পরিবার চায় সুখশান্তিতে থাকুক,
জানে সে, সকালে ওরা তৈরি হবে পথ পাড়ি দিতে,
মেয়েদের গানে আর শিশুর চিৎকারে স্বপ্নটুক
যাবে ভেঙে, নেহাইয়ে হাতুড়ি ঠুকবে শব্দ চারিভিতে।...
রাত্রি বাড়ে, দেখতে-দেখতে যাযাবর-শিবিরে কখন
নামে ঘুমজড়ানো স্তব্ধতা; শোনা যায় থেকে-থেকে
কুকুরের ডাক হেথা-হোথা, স্তেপে নৈঃশব্দ্য কেমন
শিউরে ওঠে, আচম্বিতে একটা-আধটা ঘোড়া ওঠে হেঁকে।
কোনও ঘরে নেই বাতি, একটুও আলোর রেখা নেই।
রাত্রি ঘুমে লগ্ন, স্তব্ধ চরাচর। শুধু একা চাঁদ
সুদূরে আকাশ থেকে নির্নিমেষ রইল তাকিয়েই:

অঝোরঝরন জ্যোৎস্না বয়ে গেল অগাধ অবাধ।
শিবিরে কেবল জেগে বসে ছিল বৃদ্ধ এক — পাশে
নিবুনিবু অগ্নিকুণ্ড ছড়াচ্ছিল উত্তাপ-আভা সে —
তবু শেষ ওমটুকু গায়ে মেখে বৃদ্ধ ছিল চেয়ে
দূর মাঠপারে, ক্ষীণ দৃষ্টি বিঁধে দিগন্ত-সকাশে,
যেখানে রাত্রির কালো ছিল শাদা কুয়াশায় ছেয়ে।
বৃদ্ধের তরুণী মেয়ে স্তেপের প্রান্তরে কোনো ঠাঁই
তখনও বেড়াচ্ছে ঘুরে, ও-সে আছে অপেক্ষায় তারই;
আপন খেয়ালে মেয়ে যত্রতত্র দিয়ে থাকে পাড়ি
এমনিই স্বভাব তার; তবু যত হোক, অর্ধটাই
কেটে গেছে রাত, বাঁকা চাঁদ ইতিমধ্যে যাচ্ছে নেমে
দিগন্তের দিকে দ্রুত অন্তরালে দূরের মেঘের —
জেম্‌ফিরার দেখা নেই এখনও তো, কোথা রইল থেমে?
এদিকে জুড়িয়ে গেল অল্পস্বল্প আহার্য বৃদ্ধের।

এতক্ষণে দেখা দিল মেয়ে; পিছুপিছু এল তার
সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবা; মেয়ে বললে বাপে ডেকে,
'ও বাপ, দ্যাখো-না কারে এনেছি গো! ঢিপির ওধার
দেখা হল সাথে এর, রাতের আস্তানা নেই দেখে,
মাথা গুঁজে থাকবে কোথা বেচারা-যে ভেবে শেষকালে
ডেকে নিয়ে এলাম এখেনে তাঁবুঘরে, রাতটুক
কাটাক অন্তত। ও বলে কী জানো? বলে, ভারি সুখ,
ভারি নাকি মজা ঘর-সংসারের বাঁধন কাটালে,
আমাদেরই একজনা হলে। বন্ধু হব আমি ওর,
যেখানেই যাব আমি পিছুপিছু যাবে ও — আলেকো,
আইনেও খেদানো লোকটা, নেই চালচুলো ঘরদোর,
আমাদের তাঁবুঘরে বাপ তুই ওরে ডেকে নে গো।'

বৃদ্ধ

তা বাপু, থাকো-না কেন এই ঠেঁয়ে, রাতটা ফুরাতে
চলে যেয়ো যেথা খুশি, কিংবা যদি চাও সাথে-সাথে
থেকে যেতে পার আরও ক'টা দিন, কিছুদিন বেশ,
যেমন তোমার মন চায় তাই কর। ভাগ করে
খাব রুটি, একই সাথে মাথা গুঁজে থাকব তাঁবুঘরে।
আমাদেরই একজনা হবে তুমি — কাটাবে সরেশ
জীবন লাগামছেঁড়া, ভবঘুরে বনে যাবে শেষ।
ভালো কথা, আসচে কাল রওনা দেব আমরা সবাই
হেথা হতে, তোমারেও নেব সাথে, যাত্রা — ভোরবেলা;
থাকবে সাথে-সাথে, যে-কাজ পছন্দ বেছে নেবে তা-ই:
গান গাওয়া, কামারশালায় লোহা পেটাই-গড়াই,
শেকলে ভালুক বেঁধে চরানো — এমনিই কাজ মেলা।

আলেকো

আমি রাজি আছি।

জেম্‌ফিরা

ও কিন্তু আমার, আর কারও নয় —
কে ওরে ছিনিয়ে নেবে মোর কাছ হতে? সাধ্য কার?
কিন্তু না, অনেক হল রাত... চাঁদ লুকোল কোথায়,
মাঠঘাট গেল ছেয়ে গভীর গহন কুয়াশায়,
কেন-যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে দু'চোখে আমার...

ভোর হল। নিঃশব্দ তাঁবুটা ঘিরে আনাচেকানাচে
পায়ে-পায়ে বৃদ্ধ ঘুরে বেড়াল খানিক, দিল ডাক:
'ওঠ্ রে জেম্‌ফিরা, ওঠ্: দ্যাখ্ চেয়ে সূর্য্যি উঠে গ্যাছে,
অতিথ-সুজন ওঠো, হয়ে গ্যাছে সময় বেবাক!..
সুখশয্যা ছাড়ো, ওঠো, আলস্য ভাঙো হে!'
দেখতে-দেখতে হল্লা তুলে তাঁবু ছেড়ে বেরুল বেদেরা;
যে-যার আপন তাঁবু খুলে ফেলে গোটাল আগ্রহে;
গাড়িতে বোঝাই করে মালপত্র ছাড়ল সবে ডেরা।
যাত্রা শুরু হল — চলল হেলেদুলে দৃপ্ত মানুষেরা
সমুদ্রের ঢেউ হেন ছাপিয়ে ছাড়িয়ে তেপান্তর।
স্ত্রী-পুরুষ, ভাই-বোন, বৃদ্ধ ও তরুণ পর-পর,
সার বেঁধে চলে পথ, মন্থর ধারায় জনস্রোত;
মালিকের পাশে-পাশে চলেছে গর্দভ, পিঠে থলি,
বেতের ঝোড়ায় শিশু হেসে-খেলে মাতায় জগৎ;
হল্লা, কান্না, থেকে-থেকে বেদিয়া গানের কোনো কলি,
ভালুকের হুঙ্কার ও শিকলে আচমকা ঝনঝন,
মেয়েরা চলেছে দলে — হরেক বিচিত্র রঙ্‌চঙ্
চমকে তুলে ঘাগরায় ওড়নায়, চলেছে শিশুর দল
অর্ধেক উলঙ্গ, খালি পায়ে, তবু আনন্দে উচ্ছল,
মাঝেমাঝে শোনা যাচ্ছে কুকুরের সক্রোধ তর্জন,
বেজে উঠছে ব্যাগপাইপ, গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ,
সবই তুচ্ছ, সবই দীন, বন্য, বেপরোয়া, এলোমেলো,
তবু এ প্রচন্ড বেগ, এ-জীবন অশান্ত উদ্বেলও,
কত ভিন্ন আমাদের প্রাণহীন স্বস্তির উৎকোচ,
এ থেকে পৃথক কত আমাদের জীবন অলস —
যেন সে অক্ষম গান ক্রীতদাসদের পরবশ!

আলেকো তাকিয়ে ছিল সমতল প্রান্তরের দূরে:
গোপন যন্ত্রণা এক হৃদয়কে হিম শূন্যতায়
দিচ্ছিল ভরিয়ে, তবু সে-ব্যথার উৎস-যে কোথায়
সন্ধানে নিরস্ত ছিল, কী এক আতঙ্ক মন জুড়ে।
অথচ ছিল তো ওর কৃষ্ণ-আঁখি সঙ্গিনী জেম্‌ফিরা,
ছিল ও স্বাধীন, মুক্ত পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ বিক্রীড়া,
মাথার ওপরে মেলা সূর্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ,
দক্ষিণদেশের রূপ-ঐশ্বর্যে প্রকৃতি বিলসিত,
তবু কেন আলেকোর হৃদয় বেদনা-বিচলিত?
কোন আশঙ্কায়, কোন উদ্বেগে ও শ্রান্ত হতাশ্বাস?

ঈশ্বরের প্রাণী সুখী পাখি জানে না সে
কাকে-যে উদ্বেগ বলে, শ্রম বলে কাকে;
স্বল্পজীবী গ্রীষ্মে পাখি গড়ে না আয়াসে
চিরস্থায়ী বাসা তার ডালপালার ফাঁকে;
সারা রাত্রি ঝিমোয় সে গাছের আগায়;
প্রত্যূষে রক্তাক্ত সূর্য মাথা তোলে যবে
পাখি তবে ঈশ্বরের নির্দেশে জাগায়
বন-বনান্তর তার সঙ্গীতে সুরবে।
বসন্ত অতীত হলে সুরূপা প্রকৃতি,
উষ্ণ নিদাঘের মাস গত হলে পরে,
আসে হেমন্তের সুদুঃসহ রীতিনীতি —
কুয়াশা ও কৃষ্ণমেঘ, সদা বৃষ্টি ঝরে।
মানুষের কাছে সে-যে দুর্বহ সময়;
পাখি কিন্তু সমুদ্রের পরপারে উড়ে
দক্ষিণদেশের উষ্ণ সান্নিধ্যে পৌঁছয়,
বসন্ত অবধি থেকে যায় সেই দূরে।

পথিক-পাখির মতো নিশ্চিন্ত নির্ভার ছিল সেই
জন্মভূমি ছেড়ে এসে দেশান্তরী সুদূর দেশেই
আমাদের যুবক আলেকো। ছিল না কুলায় তার,
যে-কোনো দিগন্তে পাড়ি দিতে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য অপার।
কোনো একটা জায়গা তার মনে ধরে নি কো, পথে যেতে
যেখানে ঘনাত রাত্রি সেখানেই নিদ্রা যেত ও-যে,
সদ্যোজাত প্রতি দিন সঁপে দিত অত্যন্ত সহজে
ঈশ্বরের হেফাজতে। কখনোই উঠত না কো মেতে
উদাস হৃদয় তার জীবনের হৃৎস্পন্দন পেতে,
অনুভব করতে তারই উন্মাদনা; তবু কার খোঁজে,
কোন সুদূরের তৃষ্ণা মাঝে-মধ্যে মনের গহনে
আনত ব্যাকুলতা, মুচকি হেসে অপ্রাপ্যের ইন্দ্রজাল
চকিতে উন্মাদ করে তুলত, চোখে ভাসত ক্ষণে-ক্ষণে
নৃত্যগীত-পানভোজনের দৃশ্য, উৎসব বিশাল।
ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার বজ্রের হুঙ্কারে সুভীষণ,
বরং প্রায়শ তাকে দেখা যেত দুর্যোগের রাতে
বৃষ্টিঝরা আকাশের নিচে সুখস্বপ্নে নিমগন,
কিংবা প্রভাতের খররৌদ্রে দিব্য নিশ্চিন্তে ঘুমাতে।
অন্ধ ধূর্ত নিয়তির নির্বন্ধকৌশল তুচ্ছ করে
দাঁড়িয়ে ছিল সে মুখোমুখি এক অমোঘ ভাগ্যের —
হা ঈশ্বর! তবু তার হৃদয়কে নিয়ে প্রাণভরে
কী এক খেলায় মেতে উঠেছিল বন্যা আবেগের!
দুর্দম আসক্তি, ক্রোধ পর্যুদস্ত করছিল-যে তাকে,
শান্তি মানে নি কো প্রাণ যন্ত্রণা-আহত জর্জরিত,
ছিল তারা প্রশমিত? দমিত কি? অথবা বিপাকে
ফেলেছিল? দেখা যাক — হে পাঠক, হও অবহিত!

জেম্‌ফিরা

বল তো নাগর, শুনি, ফেলে এলে যা-কিছু পেছনে,
তার জন্যে মন পোড়ে নাকি?

আলেকো

কী ফেলে এলাম? কেন?
কার জন্যে পুড়বে মন?

জেম্‌ফিরা

কেন, কিছু পড়ে না কো মনে? —
মানুষ, শহর, দেশ-গাঁ বা কিছু?

আলেকো

কই, না তো? জানো,
ওসব ঝামেলা থেকে মুক্ত আমি, কোনো কষ্ট নেই,
যদি জানতে, হারাবার মতো কিছু নেই কো সেখানেই।
মোদের শহরগুলো শ্বাসরুদ্ধ মঠের কুঠুরি,
সেখানে আনে না বয়ে দূরাগত বসন্তবাতাস
ফুলে-ছাওয়া মাঠ থেকে এতটুকু সুরভিনিশ্বাস,
এমন কি ঠান্ডা হাওয়া, তা-ও তারা করে না কো চুরি।
নিখাদ মনের কথা, প্রেম, সেথা নিন্দার ব্যাপার,
স্বাধীন চিন্তাও মানা, স্বাধীনতা বেচে দেয় লোকে,
দেবমূর্তি-পদে তারা হাঁটু গেড়ে জানায় অসার
নির্লজ্জ প্রার্থনা, চায় সোনা, বশ্যতায় মাথা ঠোকে।
কী ফেলে এসেছি শুনবে? — দুশ্চিন্তা ও মানুষঠকানো,
অন্ধ মূঢ় সংস্কার, অন্যথায় রূঢ় শাস্তিযোগ,
নিন্দার্হ গ্লানিকে উচ্চ মহত্ত্বের পোশাক পরানো,
জনতার জন্যে খালি লাঞ্ছনা ও অসহ দুর্ভোগ!

জেম্‌ফিরা

তবু তো সেখানে আছে প্রকাণ্ড উৎসব-ঘর, আছে
আলোর মালায় আর জাজিমে উচ্ছল নানারঙ্‌,
হুল্লোড়ের ভূরিভোজ, খেলাধুলো, মাতে জুড়িনাচে
জমকালো পোশাকে ধনী-মেয়েরা, দেখায় রঙ্‌ঢঙ্‌।

আলেকো

সেখানে আনন্দ নেই যেথা নেই প্রেম-ভালোবাসা,
শহুরে হুল্লোড়ে সুখ কোথা? সে-যে একান্ত বিস্বাদ!
আর সে-মেয়েরা... নেই তোমা' সাথে তুলনার ভাষা
তাদের রূপের, তারা মেটায় না প্রাণের পিপাসা
অলঙ্কারে পরিচ্ছদে, তোমা' হেন সৌন্দর্য নিখাদ
কোথা পাবে?.. প্রিয়তমা, থাকো তুমি যেমনটি আছ,
আর আমি... আমার আকাঙ্ক্ষা জেনো একটিই কেবল,
অংশীদার হব আমরা একটি প্রেমে, তুমি শুধু বাঁচো
জীবনের অংশী হয়ে দেশান্তরীর অবিচল।

বৃদ্ধ

আমাদের এ-জীবন পছন্দ তোমার আমি জানি,
যদিও জন্মেছ বড়ঘরে, ছিল সুখ-সচ্ছলতা;
তবু মানি, সেই লোক চায় না এমন স্বাধীনতা
শৈশবে ভরেছে যার আলস্যবিলাসে মনখানি।
আমাদের মধ্যে চল্‌তি আছে এক কাহিনী প্রাচীন:*
দক্ষিণদেশের কোনো রাজার হুকুমে নির্বাসিত
দেশান্তরী একজনা এ-তল্লাটে আসে একদিন।
(কী-যেন নামটা তার? এককালে ছিল পরিচিত,
এখন গিয়েছি ভুলে, উচ্চারণ করাও কঠিন।)
শুনেছি মানুষটা ছিল বয়সে প্রবীণ যথেষ্টই,
মনটা তবু ছিল তার কচিকাঁচা, উৎসাহে ভরপুর —

গান গাইত চমৎকার, গান ছিল ভান্ডারে অথই,
আর সে কী গলা, যেন জলের হিল্লোল সুমধুর।
ভাগ্যবশে দানিয়ুব-তীরে এসে গিয়েছিল থেকে,
জয় করে নিয়েছিল লোকটা সেই সকলের মন
কারও প্রাণে কষ্ট দেয়া ছিল না স্বভাবে, দিত ঢেকে
সকলের দুঃখজ্বালা গানের প্লাবনে অনুক্ষণ।
ছিল না বিষয়বুদ্ধি, সংসারে ছিল না মন তার,
একান্ত শিশুর মতো অসহায় দুর্বল সরল,
অন্য লোকে তার হয়ে করে দিত খাদ্যের যোগাড়,
পশুমাংস কিংবা মাছ — ফেলে জাল নদীতে অতল।
শীতে যবে আচম্বিতে তুষারে জমাট হোত নদী
প্রচন্ড তুষার-ঝড়ে অন্ধ হোত দিক-দিগন্তর,
লোমশ চামড়ার জামা সকলে যোগাত নিরন্তর
সাধুসন্ত বৃদ্ধটিকে, শীতে বৃদ্ধ কষ্ট পেত যদি।
তবুও উৎকণ্ঠা-ভরা দীন হৃতদারিদ্র জীবনে
কখনও অভ্যস্ত হতে পারে নি কো বৃদ্ধ আমাদের;
দিনে-দিনে হয়ে পড়ল বিশীর্ণ বিবর্ণ, ক্ষুণ্ণ মনে
জানাল — প্রচন্ড কোপে পড়েছে সে রুষ্ট ঈশ্বরের,
এ আর কিছুই নয়, প্রায়শ্চিত্ত স্বকৃত পাপের।
সে রইল প্রতীক্ষা করে প্রার্থনায় পাপ-ক্ষালনের
জন্যে দানিয়ুব-তীরে; বৃদ্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীর্ণদেহ,
অসহ মনোব্যথায় দীর্ণ ভাগ্যহত, অশ্রুজলে
করে সে স্মরণ দূর জন্মভূমি তার — সে-অমেয়
সুখের আধার, তারই ভাগ্য, ভবিষ্যৎ-চিন্তাতলে
তলিয়ে রইল সে, ক্রমে জীবন-অন্তিমে এল চলে;
মরণশয্যায় শুয়ে জানাল সে — যেন অবশেষে
দেহাস্থি ক'খানা তার পায় সে-দক্ষিণ দেশে স্থিতি,
যদিও মৃত্যুতে তার দুনিয়ার যায় না কো এসে,
মরেও তবুও শান্তি পাবে না সে — বিদেশী অতিথি!

আলেকো

তোমার সন্তানদের ভবিতব্য এমনি মর্মান্তিক
হা রোম, হা রাষ্ট্রশক্তি প্রাণোচ্ছল, বিপুল, মহান!..
খ্যাতির কী-ই বা মূল্য? — বল দেখি, বলছি কিনা ঠিক?
ঈশ্বরের গীতিকার, প্রেম আর সৌন্দর্য ব্যাখ্যান
করে যেবা, তার কাছে ঠুনকো প্রশংসার কিবা দাম?
কিবা মূল্য মরণেই গির্জার বিলাপে ঘণ্টারবে?
অথচ কাব্য তো চিরজীবী, সে-যে অনাদ্যন্ত রবে,
রবে যথা বেদেদের কথা আর কাহিনী অনাম।

কেটে গেল দীর্ঘ দু'বছর। দু'বছর পায়ে-পায়ে
পার হল দীর্ঘ পথ বেদেরা স্তেপের তেপান্তরে,
যেদিকে দু'চোখ যায় গেল তারা, প্রান্তর পারায়ে
খুঁজে নিল নিত্য-নব বাসস্থান প্রসন্ন অন্তরে।
সভ্যতা সহস্রবাহু নাগপাশে বাঁধতে পারে নি তো,
আলেকো স্বাধীন ছিল সহচর বেদেদের মতো।
অতীত জীবন ওকে স্মৃতিঘাতে করে নি মথিত:
যাযাবর — রয়ে যাবে যাযাবর-বৃত্তিতে নিরত।
জেম্‌ফিরা সঙ্গিনী ছিল, বাপ তার ছিল সহচর
তাদের জীবন নিয়ে ওর জীবনের চরাচর;
দারুণ পছন্দ ছিল বেদেদের জীবনের রীতি,
সুরেলা সীমিত বাগ্‌ভঙ্গিটি তাদের, ঝলোমলো
তারার আকাশ, নিচে দীপ্ত রাত্রি, তরল, উচ্ছল
তবুও আলস্যে-ভরা দিন, বহমান শান্তি প্রীতি।
বেদেরা যেখানে যেত সঙ্গী করে নিয়ে যেত তারা
খাঁচার বাসিন্দা এক বন্য পশু হিংস্র ভয়ংকর,
লোকালয়ে সরাইখানার পাশে গিয়ে পেত ছাড়া

ভালুক — দর্শক যত আসত ভিড় করে — অতঃপর
লাফাত, দেখাত নাচ, ডিগ্‌বাজিতে উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে,
কখনও কামড় দিত ত্যক্ত হয়ে গলার শিকলে,
কখনও-বা গর্জে উঠত ভয় দেখানোর কোনো ছলে;
ভালুকনাচের কালে বৃদ্ধ থাকত লাঠি ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে, ডুগ্‌ডুগি তার বাজাত সে মন্দাক্রান্তা চালে;
আলেকো বিভোর হয়ে গাইত গান, গলার শিক্‌লিতে
টান দিয়ে নাচাত ভালুক ঘুরে-ঘুরে; আচম্বিতে
ঘাগরায় লহর তুলে দেখা দিত এসে হেনকালে
জেম্‌ফিরা, থালায় করে পয়সা নিত দর্শকের কাছে।
রাত্রি নেমে এলে ওরা রান্না করে খেত ভুট্টাদানা;
একে-একে ঘুমে ঢুলে পড়ত সবে আগুনের আঁচে...
শিবিরে স্তব্ধতা নামত, অন্ধকার দিত এসে হানা।

সূর্যের উত্তাপে বসে বাতে-ক্লিষ্ট হাড়-ক'খানা সেঁকে
নেয় বৃদ্ধ বেদে, আর ঝুঁকে পড়ে শিশুর দোলনায়
মেয়ে তার গান গায়; আলেকো বিস্ময়ে শুধু চায়
আর কান পাতে, আর শুনতে-শুনতে ক্রোধে ওঠে ঝেঁকে।

জেম্‌ফিরা

ও বুড়ো বর, স্বামী নিঠুর,
কাটো আমায়, পুইড়ে মেরো;
ধার ধারি নে আমি কিছুর,
না ছুরি, না আগুনেরও।

ও বর, তোরে ঘেন্না করি,
আছে আমার অন্য নাগর,
দেখতে না চাই ও-মুখ তোরেই,
মরি — মরব পীরিতে ভোর।

আলেকো

চুপ, চুপ। গেয়ো না এমন গান, মিনতি আমার!
ভারি অপছন্দ মোর গানের বিদঘুটে ভাষাটাই।

জেম্‌ফিরা

সত্যি নাকি! ভাবো কী সর্বদা মন রাখবই তোমারে?
তোমার জন্যে তো নয়, নিজেরই আনন্দে গান গাই।

কাটো আমায়, পুইড়ে মারো,
রা-টি মুখে কাড়ব না কো;
ও বুড়া বর, স্বামী নিঠুর,
তারে তুমি জানবে না কো।

সে-যে মধুমাসের মধু,
গরমিকালের উত্তাপ দেয়,
অল্পবয়স, বীর সে-নাগর
বড্ড পীরিত করে আমায়।

তারে বুকে জড়াই কত
নিঝুম রাতের নিথর ছেপে,
দু'জন হেসে গড়াই কত
সোয়ামির দুর্দশা মেপে!

আলেকো

থামো-না জেম্‌ফিরা! আচ্ছা, খুশি আমি! কেমন, হল তো?..

জেম্‌ফিরা

ভাবছ কি, আমার গানে বুঝি কোনো মাথামুণ্ড নাই?

আলেকো

জেম্‌ফিরা, হচ্ছে কী!

জেম্‌ফিরা

চটে যাচ্ছ বুঝি? চটো-না, ভালো তো!

সত্যিই, আমার গানে বলছিলাম তোমার কথাই।

[গান গাইতে-গাইতে চলে যায়: 'ও বুড়া বর...' ইত্যাদি]

বৃদ্ধ

ঠিক-ঠিক, মনে পড়ছে: গানখানা ভারি মজাদার,
কতকাল-যে চল্‌তি আছে এই গান তার ঠিক নেই,
যখন জোয়ান আমি সেই বহু আগে কতবার
হাল্‌কা এই সুর ভাঁজা শুনে কী-যে উঠেছি মেতেই।
কাগুলা স্তেপের ভুঁয়ে কোনকালে শীতরাত্রে কত
আগুনের আঁচে বাচ্চা মেয়েটারে দোল্‌নায় দুলিয়ে
মারিউলা, আমার বউ, তারে ঘুম পাড়াত সতত,
এই ঘুমপাড়ানিয়া গানে তারে রাখত সে ভুলিয়ে।
যত দিন যাচ্ছে, যত বয়স বাড়ছে ক্রমে-ক্রমে
পুরনো দিনেরা সব ঝাপসা থেকে হচ্ছে ঝাপসাতরো,
তবু এই গানখানা মনের কোনায় আছে জমে,
বাপ-দাদার আমলের এই গান ভোলা সাধ্য কারও!

স্তব্ধ চারিদিক। রাত্রি। চাঁদের আলোর ছোঁয়া লেগে
দক্ষিণদেশের উষ্ণ আকাশ হীরার মতো ঝলে।
মাঝরাত্রে ঘুম থেকে জেম্‌ফিরা বাবাকে তুলে বলে:
'ও বাপ, ওঠো-না, দ্যাখো, ভয়ে ঘুম ছুটে গেছি জেগে —
আলেকোর দিকে দ্যাখো: গভীর ঘুমেও ডুবে ও-যে
কেঁদে উঠছে, বুকচাপা গোঙানিতে কাতরায় কেন-যে।'

বৃদ্ধ

জ্বালাস নে ওরে, কথা বলিস নে, চুপ করে থাক্।
শুনেছি এ-রুশদেশে আছে চল্‌তি প্রবাদ অবাক:
মাঝরাত্রে ঘুরে ফেরে ভূতপ্রেত, দানো ফেরে পাছে,
অঘোর ঘুমের মধ্যে মানুষের টুঁটিটা বেবাক
টিপে ধরে, দম আটকে দ্যাখে লোকটা বাঁচে কি না-বাঁচে;
ভোরে কিন্তু লম্বা দেয় সদলে।... আয়-না, বোস কাছে।

জেম্‌ফিরা

ও কিন্তু জেম্‌ফিরা বলে ফিস্‌ফিসিয়ে ডাকছিল আমারে।

বৃদ্ধ

ডাকবেই তো। ঘুমের মধ্যেও ও-যে খোঁজে তোরে। তুই
সবথেকে আপন ওর — (বুঝিস তা?) — এ-গোটা সংসারে।

জেম্‌ফিরা

ওর সে-পীরিত মোরে মজিয়েছে একদিন নিতুই,
আজ কিন্তু ক্লান্ত ঠেকে। প্রাণটা আজ চাইছে পেতে ছাড়া,
মুক্তি পেতে চাইছে... কিন্তু ও-কী! শুনছ? ফের ও গোঙায়,
ডাকে নাম ধরে — কারে? আমারে না, খোঁজে কার সাড়া?..

বৃদ্ধ

কারে ডাকে?

জেম্‌ফিরা

ওই শুনছ? দাঁতে দাঁত ঘষে যন্ত্রণায়
কেমন বিকট স্বরে ডেকে উঠছে!.. ভয় লাগছে বড়,

ওরে ডেকে তুলি।

বৃদ্ধ

মিথ্যে ভয় পাস, হোক যত দড়
রাতের দানোরা কিন্তু এখখুনি পালাবে ভোর হলে —
শান্ত হ' রে তুই।

জেম্‌ফিরা

ও ফের উঠেছে বসে খাড়া হয়ে,
নাম ধরে ডাকছে মোরে... আছে কিন্তু ঘুমের আলয়ে।
আমি যাই, কাছে যাই ওর। — বাপ, ঘুমোও তাহলে।

আলেকো

ছিলে কোথা এতক্ষণ?

জেম্‌ফিরা

ছিলাম বাপের কাছে বসে।
জানো কী, রাতের দানো তোমা' পরে করেছিল ভর;
ঘুমের মধ্যেও এসে বুকখানা ছিঁড়েকুটে ও-সে
অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে গেছে; আমি কেঁপেছি থত্থর
ভয়ে-ভয়ে। দাঁতে দাঁত ঘসে তুমি বড় কষ্ট সয়ে
ডেকেছ আমারে নাম ধরে।

আলেকো

স্বপ্নে দেখেছি তোমায়।
বড্ড অলুক্ষুণে স্বপ্ন দেখেছি গো... চোখে ধাঁধা হয়ে
মোদের তফাত করে মাঝে কে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়!

জেম্‌ফিরা

মিথ্যে কেন স্বপ্ন দেখে ব্যস্ত হও? স্বপ্ন মানো নাকি?

আলেকো

কিছুই মানি না আমি, হা রে পোড়াকপাল আমার!
না স্বপ্ন, না মিষ্টি-মিষ্টি আশ্বাস, শপথ — আস্থা রাখি
তোমার 'পরে-যে এত শক্তি দেখি নেই এ-মনটার।

বৃদ্ধ

কেন হে উন্মাদ ছোকরা সারাক্ষণ এমনই হাঁকপাঁক
করছ? খালি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ, বাপু? এখানে স্বাধীন
সবাই মানুষজন, আকাশও নির্মল, মেঘহীন,
মেয়েরা সুন্দরী সবে ডাকসাইটে, দারুণ নামডাক।
থেকো না গুমরিয়ে হেথা, গ্রাস তবে করবে মনস্তাপ।

আলেকো

জেম্‌ফিরা আমাকে আর বাসে না কো ভালো, ওগো বাপ!

বৃদ্ধ

শান্ত হও, বাছা। শোনো, মেয়েটারে বাচ্চা বলা চলে।
কাজেই তোমার যত হা-হুতাশ নিতান্ত বোকামি:
তোমার এ-ভালোবাসা সৃষ্টিছাড়া দুঃসহ পাগলামি,
মেয়েদের মন কিন্তু লেনাদেনা করে খেলাচ্ছলে।
ওপরে তাকাও — দ্যাখো, আকাশের ধনুক-বিস্তারে
কেমন স্বচ্ছন্দে চাঁদ হালকা চালে চলে ইতিউতি;
আর পথ চলতে-চলতে গোটা বিশ্বপ্রকৃতি-আধারে
অফুরান জ্যোৎস্নাধারে ঢেলে দেয় আলোর বিভূতি।
পথে যদি মেঘ পড়ে কিছুক্ষণ সঙ্গী হয় তার,
মেঘেরে করায় স্নান অজচ্ছল আলোর ঝর্নায়,
তারে ছেড়ে পরে অন্য মেঘে ভর করে পুনর্বার,

তারেও আলোক-স্নানে স্নিগ্ধ করে ছেড়ে চলে যায়।
এমন যে-চাঁদ তার মুক্ত, নিরুদ্দেশ পথচলা
বন্ধ করে একঠাঁই বন্দী তারে করাটা যেমন,
তরুণী কন্যের মন বেঁধে রাখা তেমনই নিস্ফলা,
বলা তারে: মতি রাখো একটিই পুরুষে সারাক্ষণ!
কাজেই, কিসের দুঃখ?

আলেকো
কত ভালোবাসত সে আমায়!
আদরে সোহাগে গলে কেমন বুকের 'পরে ঝুঁকে
কাটাত সুদীর্ঘ রাত, নিঝুম প্রহর, মনোসুখে,
আমাকে অস্থির করে তুলত, নিজে জেগে থাকত ঠায়!
একেবারে শিশু হেন পরিপূর্ণ আনন্দবিহ্বল
কত শতবার সে-যে শ্রুতিসুখ কাকলি-কূজনে
মুখর, বিবশ মোরে করে দেছে সোহাগচুম্বনে,
দূর করে দেছে যত চিন্তা-ভয়, লুপ্ত মনোবল
মুহূর্তে পেয়েছি ফিরে, দূরে গেছে নিরাশা নিমিষে!..
অথচ এখন? সে-ই সোহাগিনী জেম্‌ফিরা শীতল
হিম হেন; আমার জেম্‌ফিরা আজ বিশ্বাসহন্ত্রী-সে!..

বৃদ্ধ
শোন বাছা, বলি তবে বড় এক বিচিত্র কাহিনী
আমার এ-জীবনের, এতদিন যা কারে বলি নি।
এটা ঘটেছিল বহু-বহুদিন আগে, যে-সময়
মস্কো আমাদের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না
(বুঝলে হে আলেকো, আমি মন খুলে দেখাচ্ছি তোমায়
অনেকদিনের ক্ষত, পুরাতন দগ্‌দগে বেদনা), —
সন্ত্রস্ত ছিলাম মোরা সে-সময় সুল্‌তানের দাপে;

সুউচ্চ প্রাসাদ-দুর্গ আকের্মানে হয়ে সমাসীন
বুদ্জাক শাসন করত পাশা এক দোর্দণ্ডপ্রতাপে —
তখন বয়স ছিল অল্প, মন ভয়ভাবনাহীন,
টগবগে ঘোড়ার মতো আনন্দে আটখানা অনুক্ষণ;
মাথাভরা থোকা-থোকা চুল, কোঁকড়ানো চুলের রাশে
একটিও রুপোলি সুতো উঁকিঝুঁকি দেয় নি তখন।
অজস্র সুন্দরী মেয়ে ঘুরেফিরে বেড়াত আশপাশে,
তবু তার মধ্যে ছিল একজনা... যারে দূর থেকে
ভালোবেসে প্রাণমন সকলই করেছি সমর্পণ,
শেষে একদিন তারে নিলাম আপন করে ডেকে...

হায়-হায়, তড়িদ্বেগে ছুটে-যাওয়া উল্কার মতন
যৌবন পালায়, পিছে এতটুকু চিহ্ন রাখে না সে,
তবু তারও চেয়ে দ্রুত দিয়ে মাত্র জানানি আভাসে
যায় ছুটে প্রেম-ভালোবাসা: শুধুমাত্র একবছর
মারিউলা আমায় ভালোবেসেছিল সোহাগসম্ভাষে।

ইতিউতি ঘুরতে-ঘুরতে কাগুলনদীর বরাবর
একবার পেলাম দেখা অন্য এক বসত-ছাউনির;
ভিন্ন বেদে-সম্প্রদায় ছিল সেটা, পাহাড়ের গায়ে
আমাদের তাঁবু ঘেঁষে রইল তারা আস্তানা বিছায়ে;
কাটিয়ে দিলাম মোরা পাশাপাশি গোটা দু'রাত্তির।
তেরাত্তিরে তারপর ওরা সরে পড়ল চুপিসারে —
আর তারই সঙ্গে পিছে ফেলে রেখে কচি মেয়েটারে
পালাল মারিউলা রাতারাতি কারে কিছুটি না-বলে।
এদিকে সারাটা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ভোর হলে
দেরি করে ঘুম থেকে উঠে দেখি -- কোথাও সে নাই!
কত খোঁজাখুঁজি, কত ডাকাডাকি, দৌড়ুনো — বৃথাই

হল সব... জেম্‌ফিরা অস্থির হল মা-কে চেয়ে অতি,
আমিও অধীর হয়ে কেঁদেছি — তবুও তারপর
ঘৃণায় এড়িয়ে গেছি দুনিয়ার যতেক যুবতী,
প্রবৃত্তি হয় নি আর সাধ করে বাঁধি ফের ঘর
অন্য মেয়েদের মাঝে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিয়ে —
কারেও আপন করি নি কো সুখে-দুঃখে অংশ দিয়ে,
সেই থেকে এ-যাবৎ কাটিয়েছি একার জীবন।

আলেকো

কিন্তু কেন, বুড়ো কর্তা, কেন তাড়া করে সেইক্ষণ
ধর নি সে-পশুটাকে, বউকেও তোমার? যারা হেন
অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক? ছুরির ফলায় কেন
হৃৎপিন্ড উপড়িয়ে টুকরো-টুকরো করে দিলে না মরণ?

বৃদ্ধ

যৌবন স্বাধীন পাখ-পাখালির চেয়ে, শোন বলি;
ভালোবাসা বেঁধে রাখবে চিরকাল খাঁচায় — বল কে?
যতক্ষণ আছে, সে-যে মহানন্দে মাতাবে সকলই;
তবু কিন্তু এই-আছে এই-নেই, পালায় পলকে।

আলেকো

না, আমি ধারি না ধার অতশত তর্কের, কথারে।
ন্যায্য অধিকার আমি কোনোমতে কখনও ছাড়ি না,
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পেলে না-করে পারি না।
কখনও না! যদি-বা কখনও ধু-ধু সমুদ্রে অপার
তারও মধ্যে পেয়ে যাই শত্রুকে আমার অতর্কিতে,
ঈশ্বরের দিব্য, আমি কুণ্ঠিত হব না ফেলে দিতে
একটিই লাথির ঘায়ে তাকে সেই সমুদ্রের জলে
উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে; বিবর্ণ হবে না মুখ, টলে

উঠবে না কো পা আমার — দেখে তারে অসহায়-বেশে।
বরং আতঙ্কে হিম দিশাহারা ভাব দেখে তার
ফেটে পড়ব বারে-বারে নিষ্ঠুর হাসিতে সর্বনেশে,
তারও পরে সেই কথা স্মরণ করে-যে কতবার
খুশি হব, ভাবি তা-ই, কত-যে আকুল হব হেসে।

তরুণ বেদে
আরও একটা... আরও একটা চুমো দাও, জেম্‌ফিরা সুন্দরী...

জেম্‌ফিরা
না-না, চলি। জানো তো কত্তাটি বড্ড হিংসুটে, বদরাগী।

তরুণ বেদে
আরও একটা... এই শেষ!.. শেষবার একটু বুকে ধরি।

জেম্‌ফিরা
বিদায়! আবার দেখা হবে, তারই অপেক্ষায় থাকি।

তরুণ বেদে
বলে যাও — কবে, সে-কোথায় দেখা হবে এর পরই?

জেম্‌ফিরা
দেখা হবে আজ রাতে, পাটে বসলে শেষরাতের চাঁদ,
যেখানে কবরখানা — সেইখানেই ঢিপির ওধার...

তরুণ বেদে
না — তুমি আসবে না, জানি। এ তোমার ছলনার ফাঁদ!

জেম্‌ফিরা
আচ্ছা, আচ্ছা, কথা রাখব!.. লক্ষ্মী-সোনা, পালাও এবার।

আলেকো ঘুমোয় আর বুকে চাপে দুঃস্বপ্নের ভার,
ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি তাড়া করে ফেরে যেন তাকে;
হঠাৎ চিৎকার করে ঘুম ভাঙে তার, অন্ধকার
বিছানা হাতড়ায় দুটো ত্রস্ত হাত, খোঁজে জেম্‌ফিরাকে।
কিন্তু তার থরোথরো হাতে শুধু দোমড়ানো-মোচড়ানো
শয্যার চাদর ঠেকে, ঠেকে স্তব্ধ হিমেল শূন্যতা —
জেম্‌ফিরা কোথায় গেল (ওগো তোমরা কেউ কী তা জানো!)...
কাঁপতে-কাঁপতে শয্যা ছাড়ে আলেকো... অতল নীরবতা
ঘিরে আছে চারিদিক — আতঙ্কে হারায় মুখে কথা —
ভয়ে উত্তেজনাবশে ক্ষণে-ক্ষণে তপ্ত ও শীতল
হয় তার দেহ, দ্রুত তাঁবু ছেড়ে বাইরে চলে আসে,
পাগলের মতো ঘোরে সার-সার গাড়ির আশপাশে;
দ্যাখে, চারিদিক স্তব্ধ, স্তেপভূমি তন্দ্রায় বিকল;
অন্ধকার; মুখ ঢাকে চাঁদ ছেঁড়া কুয়াশার ফাঁকে,
তারা মিটিমিটি করে, আলো দেখা যায় কি না-যায়,
শিশিরে ঝিলিক হেনে উপস্থিতি আভাসে জানায়
পথের — যে-পথ গেছে কবরখানার দূর বাঁকে:
আলেকো সে-পথে ধায়, উদ্বেগে অধীর তার মন,
সেই পথে সর্বনাশ ইশারায় রাখে আমন্ত্রণ।

রাস্তার ধারেই এক কবরের ঢিপি শাদামতো
অন্ধকারে খাড়া সামনে — সেই দিকে দৃষ্টি আলেকোর...
অনিচ্ছুক পা-দুটোকে টেনে-টেনে সেই দিকে যত
এগোয়, ততই এক অজানা শঙ্কায় মন ওর
ভরে ওঠে, থরোথরো কাঁপে ঠোঁট, হাঁটুদুটো কাঁপে,
এগোয় তবু ও ... আর হঠাৎ ... নাকি এ ঘুমঘোর?
হঠাৎ সামনে সে দ্যাখে দুই ছায়ামূর্তি রাত্রি যাপে
জাগরণে, আরও কাছে এসে শোনে, রয়েছে বিভোর
অস্ফুট সংলাপে দুই মূর্তি নোংরা কবরের 'পরে।

প্রথম কণ্ঠ

চলি...

দ্বিতীয় কণ্ঠ

একটুকু দাঁড়াও!

প্রথম কণ্ঠ

লক্ষ্মিটি, এবার যাই ঘরে।

দ্বিতীয় কণ্ঠ

না গো, না, আরেকটু থাক, একটুখানি, আগে হোক ভোর।

প্রথম কণ্ঠ

বড্ড দেরি হয়ে গেল।

দ্বিতীয় কণ্ঠ

এত ভিতু ভালোবাসা! আশ
মেটে না-যে!

প্রথম কণ্ঠ

তুমি দেখছি ডেকে আনবে মোর সর্বনাশ।

দ্বিতীয় কণ্ঠ

আরেক মিনিট!

প্রথম কণ্ঠ

কিন্তু আমারে না-দেখে কত্তা মোর
জেগে ওঠে যদি, তবে?..

আলেকো

আমি রয়ে গেছি হে জাগাই।

পালাচ্ছ কোথায়? বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথা দু'জনায়?
দিব্যি তো মানিয়ে গেছ এখানে এ-কবরখানায়।

জেম্‌ফিরা

পালাও, পালাও, ও নাগর...

আলেকো

পালাবার পথ নাই!

অত ব্যস্ত হোয়ো না হে সুপুরুষ নাগরগোঁসাই!
বরং এখানে শোও!

[ছুরিকাঘাত করে

জেম্‌ফিরা

আলেকো!

তরুণ বেদে

আমার জান্‌ শেষ...

জেম্‌ফিরা

সর্বনাশ! ওরে তুমি খুন করে ফেলেছ আলেকো!
তোমার ও-হাত বেয়ে ঝরে পড়ছে তাজা রক্তরেশ!
হায়-হায়, কী করেছ?

আলেকো

তা নিয়ে একটুও ভাবি নে কো।

যা হোক, এখন তুই ছোঁড়ার পীরিতে মজে বেশ
ডুবে থাক্‌।

জেম্‌ফিরা

হা রে, তোরে করি না কো ভয় সর্বনেশে!
শাসানি-ফোঁসানি তোর দেখে মনে এত ঘেন্না জাগে,
তোর খুন-খারাপিতে যেন অভিসম্পাত-সে লাগে...

আলেকো

বটে! তবে তুই মর্‌!

[ছুরিকাঘাত করে

জেম্‌ফিরা

মরে যাচ্ছি ওরে ভালোবেসে...

প্রাচ্যের আলোয়-আলো উদ্‌ভাসিত দিন দিল দেখা
অবশেষে। আলেকো তখনও হাতে ধরে ঠাণ্ডা হিম
ছুরিখানা, রক্তমাখা পোশাক-আশাকে একা-একা
ছিল বসে স্পন্দহীন কবরের পাথরে। নিঃসীম
স্তেপভূমি সামনে, পদতলে দুই মৃতদেহ প'ড়ে;
ভয়ঙ্কর মুখ নিয়ে খুনী বসে ছিল ধরে ঝিম।
আর তার চারিপাশে দেখতে-দেখতে এল ভিড় করে
নিরীহ বেদের দল, হতবুদ্ধি, আতঙ্কে বিহ্বল।
কবর খোঁড়ায় রত হল কেউ-কেউ ধারেকাছে।
মৃতদের চোখে চুমো দিয়ে গেল ফেলে অশ্রুজল
শোকাচ্ছন্ন বেদেনীরা, একে-একে এসে আগে-পাছে।
জেম্‌ফিরার বুড়ো বাপ বসে ছিল একা, দুটো চোখ
একান্ত নিবদ্ধ ছিল শবদুটি ঘিরে, ক্ষোভ, শোক,
দীর্ণ মর্মবেদনায় আছিল সে আচ্ছন্ন, স্তম্ভিত।
এবার বেদেরা মৃতদেহগুলি বয়ে নিয়ে গেল,

শীতল মাটির বুকচেরা দুটি কবরে শোয়াল;
তরুণযুগল শেষে হল শেষশয়নে মিলিত।
এতক্ষণ সবকিছু আলেকো দেখছিল দূরে থেকে
উদাস নয়নে... আর অকস্মাৎ হয়ে বিচলিত —
যখন মাটির শেষ মুঠি দিল শবদুটি ঢেকে —
নিঃশব্দে সুধীরে সে-ও খসে পড়ে গেল সেইক্ষণ
পাথরের ঢিপি থেকে সিক্ত ঘাসে বিগতচেতন।

এতক্ষণে বৃদ্ধ বেদে কাছে এল, বলল মাথা নেড়ে:
'আপনসর্বস্ব যুবা, যাও — ছেড়ে যাও আমাদেরে।
আমরা বুনো মনিষ্যি; মোদের ভিন্ন রীত, ভিন্ন প্রথা,
সয় না মোদের খুন-খারাপি ও আঘাতপীড়ন,
রক্তপাতে ডর লাগে, অত্যাচারে মনে পাই ব্যথা,
খুনীরে মোদের দলে ঠাঁই দিতে নারাজ এ-মন...
তোমার হয় নি জন্ম মুক্ত জীবনের খেলাঘরে,
চাইলে তুমি স্বাধীনতা শুধুমাত্র আপনার তরে;
তুমি আমাদের নও, অসহ্য তোমার সংস্রব,
আমরা ভালোমানুষ, হৃদয়ে দয়ামায়া যত চাও,
তুমি রুক্ষ, বদমেজাজী — যাও ছেড়ে আমাদেরে সব,
আশা করি ভালো হোক, কষ্ট ভুলে শান্তি ফিরে পাও।'

কথা শেষ করল বুড়ো। দেখতে-দেখতে তুলে উচ্চরব
শিবির গুটিয়ে নিয়ে রওনা দিল যাযাবর-দল,
পিছে ফেলে ভয়ঙ্কর দৃশ্যপট দুঃসহ রাত্রির।
পার হয়ে স্তেপভূমি দ্রুত দূরে মিলাল সকল।
শুধু পিছে রয়ে গেল একখানি শকটশিবির,
জীর্ণ রঙ্‌চটা তার জাজিমের আচ্ছাদন নিয়ে
একা সে-প্রান্তরে, রক্তমাখা রাত্রি স্মরণ করিয়ে।
এ যেন তেমনই — প্রতি শীতের আগেই মাঝে-মাঝে

যখন সকাল থাকে মুখ ঢেকে কুয়াশার সাজে
তখন বিষণ্ণ মাঠ ছেড়ে যথা সারসের ঝাঁক
ডানায় উড়াল দেয়, চলে যায় দক্ষিণে বেবাক
তীক্ষ্ম কলরবে, যায় রেখা এঁকে সুদূর পথের;
পিছে রেখে যায় তারা নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে
ডানায় বুলেট-বেঁধা আহত সঙ্গীকে এক — ফের
যে-পাখি উড়াল দিতে চায় ব্যর্থ ভগ্ন ডানা নেড়ে।
আবার ঘনাল রাত্রি; অন্ধকার শকটের নিচে
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাল না কেউ, পরিত্যক্ত ছাদের তলায়
কেউ উঠে এল না কো, সুখশয্যা রইল পড়ে মিছে,
রাত্রি হল ভোর, সবই ডুবে রইল হা-হা শূন্যতায়।

উপসংহার

সুদূর অতীত থেকে সময়ের কুহেলি সরিয়ে
আমার এ হাতে-ধরা কুহক-দণ্ডটি কবিতার
জাগায় হরেক দিন নানারঙ প্রলেপ ধরিয়ে —
কখনও সুখের, কভু বেদনার অশ্রুর বিস্তার।

সে-তল্লাটে — যেথা ঘটে গেছে যুদ্ধ বহুতরো, নানা,
সমরাগ্নি কোনোদিন নির্বাপণ জানে নি যেখানে,
যেখানে ছড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের সুবিশাল ডানা
রুশসেনা গেছে ধেয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুল-পানে,
মোদের প্রাচীন সেই দ্বিমুণ্ড ঈগল আজও যেথা
সদম্ভে ঘোষণা করে অতীত গৌরব-কথা — সেথা
সেই স্তেপভূমি 'পরে কতদিন হয়েছে-যে দেখা
হরেক হরবোলা দলে বেদে মেয়ে-পুরুষের সাথে
শিবিরের সীমানায়, শকটছায়ায়, দিনে-রাতে:
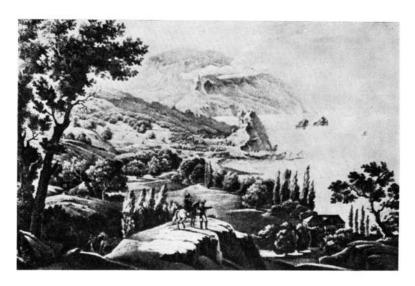
গ্রুরজ্রুফ, ক্রিমিয়া। নিচে দক্ষিণ কোণের বাড়িটিতে প্রুশকিন ছিলেন ১৮২০ সালে।

প্রুশকিনের বিখ্যাত কাব্যে বর্ণিত বাকচিসরাই প্রাসাদে
অশ্রুর ফোয়ারা।

পুত্র সহ মারিয়া ভলকোন্স্কায়া (১৮০৫-১৮৬৩)। জেনারেল রায়েভ্স্কির কন্যা, ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের শরিক, প্রিন্স সের্গেই ভলকোন্স্কির স্ত্রী। ১৮২৬ সালে তিনি অভিজাত কুলের সমস্ত অধিকার ও বিশেষ সুবিধা ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে চলে যান সাইবেরিয়ার নির্বাসনে। তরুণী মারিয়ার প্রেমে পড়েছিলেন পুশকিন, পরে তাঁর নাগরিক ধার্যের খুবই প্রশংসা করতেন। জলরঙ, ১৮২৬

ইয়েলিসাভেতা ভরোনৎসোভা (১৭৯২-১৮৮০), কাউণ্ট ভরোনৎসোভের পত্নী, ১৮২০-এর দশকে পুশকিন তাঁর উদ্দেশে লেখেন বহু প্রেম-কবিতা। এনগ্রেভিঙ, ১৮২৯

ভেরা ভিয়াজেম্‌স্কায়া (১৭৯০-১৮৮৬)। প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কির স্ত্রী. পুশকিনের বিশেষ বন্ধু।

ওদেসা বন্দর। আইভাজোভ্‌স্কি অংকিত চিত্র, ১৮৪০-এর দশক

মাটির মানুষ তারা মুক্তপ্রাণ — মনে আছে আঁকা।
তাদের মন্থর সেই জীবনধারায় মিশে গিয়ে
রুক্ষ মরুদেশে হেথা-হোথা ঘুরে কাটিয়েছি কাল,
গ্রহণ করেছি অন্ন ভাগ করে সকাল-বিকাল,
তাদের সাথেই অগ্নিকুন্ড-পাশে পড়েছি ঘুমিয়ে।
যাত্রাপথে সহচর, অংশ নিয়ে সুখে-দুঃখে তথা
বেদিয়া গানের সুর ক্রমে আমি ভালোবাসলাম,
শুনলাম — আছিল এক মারিউল্যা সুন্দরী — তার কথা,
নিজে আমি প্রেমে কত উচ্চারণ করেছি সে-নাম।

হায় রে তবুও, ওরে প্রকৃতির দুঃখের দুলাল,
আমাদেরই মতো তোরা পাস নি কো সুখের আস্বাদ!
মুক্ত প্রকৃতির বুকে তাঁবুর নিচেও চিরকাল
বন্দী করে রাখে তোরে দুঃখ-শোক-দুঃস্বপ্নের ফাঁদ।
যাযাবর ও-জীবনে যতই করিস আনাগোনা
দূর মরু-পার, তবু সংকটে মেলে না অব্যাহতি,
যতই পালাতে চাস মেটে না-যে প্রাণান্ত কামনা,
কোনো পরিত্রাণ নেই — জাগরূক সর্বদা নিয়তি।

(১৮২৪)

ব্রোঞ্জ-অশ্বারোহী*

সেণ্ট পিটর্সবুর্গের কাহিনী

মুখবন্ধ

এ-কবিতায় বর্ণিত কাহিনী সত্যঘটনা-ভিত্তিক। প্লাবনের বিবরণ সংগৃহীত হয় তৎকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে। কৌতূহলী পাঠক ভ. ন. বের্‌খ-এর লিখিত বিবরণীর সঙ্গে উল্লিখিত ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

উপক্রমণিকা

যেখানে নির্জন নদী তরঙ্গউত্তাল অন্তহীন
তারই তীরে দাঁড়াল **সে,** নদীর বিস্তারে চিন্তালীন
তাকাল বারেক। নদী প্রসারিত সামনে তার
প্রবল বহতা। শুধু একখানি ডিঙি ক্ষুদ্র, দীন
ছুটে চলে তীব্র স্রোতে কেঁপে-কেঁপে উঠে বারবার।
শ্যাওলাঢাকা, কর্দমাক্ত জলাজমি গোটা নদীতীর —
তারই পরে হেথা-হোথা কালো-কালো কৃষককুটির,
দীনহীন ফিন্‌দের হতভাগ্য ডেরা গুটিকয়;
আর বন, সূর্যালোক পশে না সে এমন নিবিড়,
সূর্যও লুকোয় মুখ কুহেলিতে সদা, শব্দময়
সেথা চারিধার।
দূর-কল্পনায় হল সে তন্ময়:
সুইডিশ-সে আগ্রাসক, গতি তার রুখব এইখানে।

বসাব নগর এক সুবিপুল হেথা সুনির্ভয় —
দম্ভী প্রতিবেশী যাতে ত্রস্তব্যস্ত হয়, শান্তি মানে।
এ-বিধান প্রকৃতিরই, মেনে নেব এ-নির্দেশ তারই:
খুলে দেব ইউরোপের বাতায়ন দিগন্তপ্রসারী,
এবং সমুদ্রতীরে গড়ব এক পাদপীঠ দৃঢ়।
বিচিত্র পতাকাবাহী সকল দেশের তরী যত
সমুদ্র পেরিয়ে এই তীরে ভিড়বে অতিথির মতো,
অবারিত আমন্ত্রণে বাঁধব সবে বন্ধুতায় চির।

শতাব্দী পেরুল, তবু রয়ে গেল তরুণী নগরী,
উত্তরদেশের গর্ব, শোভার আধার, পরিত্রাতা,
বিলসিত রাজেন্দ্রাণী, মুকুটিত, দৃপ্ত, মরি-মরি,
অন্ধকার কর্দমাক্ত বন থেকে যে তুলেছে মাথা।
একদিন এখানে ফিন্‌দেশী জেলে, দীন, ভাগাহত,
ঈশ্বরেরও পরিত্যক্ত, হানা দিত এসে যে-নির্জনে,
একা-একা ফেলে জাল শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ, গ্রন্থিগত,
রহস্যরোমাঞ্চে-ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন জলে অন্যমনে —
এই সে-ই নদীতীর প্রাণ পেয়ে উঠল জেগে তবে,
এখানে এখন মাথা তোলে মত্ত বিজয়গৌরবে
শতশত প্রাসাদের মিনারের চূড়া, প্রতিক্ষণে
বন্দরে জমায় ভিড় জাহাজের পাল, মাস্তুলের
বিরাট জটলা, দূর-সুদূরের বার্তা নিয়ে ঢের
আসে ত্বরা আমাদের প্রাচুর্যের আস্বাদগ্রহণে।
গ্রানিট-পাথরে বাঁধা পড়ল গজগামিনী-সে নেভা,
শত সেতু দুলছে তার রমণীয় বরমাল্য গলে,
সঘনসবুজ শত উদ্যানের চামরের দোলে
একদা-ঊষর দ্বীপপুঞ্জ তবে করছে তার সেবা।
এ-যে আজ রাজধানী — এই নবযৌবনার পাশে
প্রাচীন মস্কোও ম্লান হয়ে গেল — ধূসর, করুণ —

যথা, রাজসিংহাসনে বসে যবে তরুণী কন্যা-সে
পাশে তার রক্তাম্বরা রানী-মাকে ঠেকে কী নির্গুণ।

আমি ভালোবাসি তোরে, পিটরের মানসসন্তান,
ভালোবাসি সমুন্নত তোর গৃহরেখার মহিমা,
এমন কি দুর্দান্ত নেভা বুকে তোর ধীরে বহমান,
সে-ও মেনে নিল তার গ্রানিটে-আবদ্ধ তটসীমা।
ভালোবাসি নেভাতীরে শিল্পরুচি লৌহ-জালিকাজ,
তোর স্বপ্নসম্যাহিত বিষণ্ন মধুর রাতগুলি,
চন্দ্র বিনা আলোকিত, উজ্জ্বল গোধূলি তোর সাজ।
যবে আমি ঘরে বসে পদরচনায় থাকি ভুলি',
কিংবা পুথি-হাতে মগ্ন থাকি — পাশে জ্বলে না কো বাতি —
তখন উজ্জ্বল আলোঝলকিত রাস্তারা বেসাতি
ভুলে সুখে নিদ্রা যায় বাড়ির ওপারে… শুধু দূরে
নৌসেনা-ভবনচূড়া ঝলমলায় আকাশকে খুঁড়ে।
ফের রাত্রি-অন্ধকার যাতে সোনা-ছড়ানো আকাশ
ছেয়ে নাহি ফেলে, তা-ই ভোরের গোধূলি দ্রুত এসে
আলিঙ্গনে বেঁধে সন্ধ্যা-গোধূলিকে ছড়ায় উদ্ভাস,
রাত্রিকে সময় দেয় মাত্র অর্ধঘণ্টাকাল হেসে।
ভালোবাসি তোর শীতঋতু, শুদ্ধ, কঠোর, নির্মম,
নিথর নিশ্চুপ হাওয়া, হিমের দারুণ পাণ্ডু প্রভা,
নেভার প্রশস্ত বাঁধে স্লেজগুলি ছোটে উল্কাসম,
যুবতীর পাণ্ডু গালে দেখা দেয় রক্তরঙ-শোভা
কলরবে ঝলকিত যবে জুড়িনাচের আসর;
এবং অবিবাহিত যুবকের আড্ডায় যখন
গেলাসে-গেলাসে ফেন-হিস্‌হিস উৎসব মুখর,
মিশ্রিত মদ্যের পাত্রে ওঠে নীলশিখার নিক্কণ।
আমি ভালোবাসি যবে দেখা দেয় যুদ্ধ-উন্মাদনা,
'রণদেবতার ক্ষেত্র'এ নকল মহড়া চলে যবে,

অশ্বারোহী পদাতিক কুচকাওয়াজে মাতে সগৌরবে,
সারিবদ্ধ প্রতিসাম্যে জাগে এক অপূর্ব দ্যোতনা;
রণক্লান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এই দেখি বিজয়ী পতাকা
সমুন্নত শিরে ধায়, এই দেখি নিক্ষিপ্ত উষ্ণীষ
গড়াগড়ি দেয় ধূলিশয্যা 'পরে — ভুজঙ্গ নির্বিষ,
তাদের মসৃণ দেহ বুলেটের ক্ষতচিহ্নে ঢাকা।
আমি ভালোবাসি তোরে, রে যোদ্ধৃ-নগরী, বীরনারী,
যবে তোর দিকে-দিকে শুনি দৃপ্ত কামান-গর্জন,
জারের তরুণী ভার্যা যবে উপহার দেয় তারই
প্রথম পুত্রকে রাজপ্রাসাদেরে; সুখমগ্ন-মন
সগর্বে যখন আমরা জয়োৎসবে করি-বা স্মরণ
রাশিয়ার শেষতম যুদ্ধজয় মহা-আড়ম্বরে;
কিংবা যবে নেভা তার নীলাভ সে-তুষারশৃঙ্খল
চূর্ণ করে ছুটে চলে সমুদ্রসমীপে অনর্গল,
বসন্তদিনের স্পর্শে শিহরিত ফুল্ল কলস্বরে।

পিটর-নগরী, তবে থাক তুই দৃঢ়, সমুদ্যত,
চিরজীবী আমাদের রাশিয়ারই মতো। তোর কাছে
প্রাকৃতিক উপপ্লব যেন থাকে বশীভূত নত,
বিদ্রোহে মাতাল যেন হয় না কো, চিরশান্তি যাচে;
ঘুম যা, ঘুম যা তোরা ফিন-সাগরের ঢেউ যত;
অতীতের যত সব রক্তক্ষয়ী কলহের রেশ
চুকে যাক, বিসংবাদ চিরতরে হোক-না নিঃশেষ,
পিটরের মহানিদ্রা হোক শান্ত, দুঃস্বপ্নবিহীন!

এসেছিল একদা সে-বিভীষিকাময় ক'টি দিন...
আমাদের স্মৃতিতে তা রবে চিরকাল জাগরূক...
তারই কথা, বন্ধুগণ, তোমাদের দিতে উপহার
কলম ধরেছি আজ। শোনো সবে যে আছ উৎসুক...
দুঃখভারাক্রান্ত কিন্তু হবে জেনো কাহিনী আমার।

প্রথম তরঙ্গ

অন্ধকারে নিমজ্জিত পেত্রগ্রাদ শহরের 'পর
শেষ হেমন্তের তীব্র হিমশ্বাস ফেলে নভেম্বর।
গ্রানিটে-বাঁধানো দুই তটে তার ভয়ঙ্কর ঢেউ
প্রচণ্ড আওয়াজে ভাঙে, করে খালি আথালপাথাল
অশান্ত উন্মত্ত নেভা, জ্বরে শয্যা নিয়ে যেন কেউ
ছটফট-ছটফট করে, বারেবারে প্রলাপে উত্তাল।
তখন গভীর রাত, পৃথিবী আঁধারে ঘিরে আছে;
সক্রোধে আঘাত হানে বৃষ্টিধারা জানালার কাচে,
হাওয়া হাউহাউ হাঁকে যেন বন্য পশু অবিরাম।
এমন সময়ে কোনো আমন্ত্রণে পানাহার সেরে
দুর্যোগ মাথায় করে তরুণ ইয়েভ্‌গেনি বাড়ি ফেরে...
ধরা যাক আমাদের কাহিনীতে নায়কের নাম
ছিল ওইরকম। তাছাড়া নামটিও সুখশ্রাব্য বটে,
নায়কের উপযুক্ত নামও। তদুপরি বলি অকপটে,
আমার কলমে এই নামটা দিব্যি সহজ স্বজন
হয়ে আছে দীর্ঘদিন। পদবিরও নেই প্রয়োজন
আমাদের ইয়েভ্‌গেনির। যদিও অতীতে একদিন
পদবিমাহাত্ম্য হয়তো আলো করে রাখত চতুর্দিক;
কে জানে কুলুজিকার শ্রুতকীর্তি সেই কারামজিন
রেখেছে অমর করে এ-বংশলতিকা কিনা — ঠিক
জানা নেই তা-ও; কারও মনে নেই কিছু অতশত।
আমি খালি বলতে পারি আমাদের নায়ক অন্তত
পেশায় কেরানি ছিল, বাস করত কলোম্‌না পল্লীতে,
অভিজাত বাবুদের এড়িয়ে চলত সে চারিভিতে,
আত্মম্ভরী উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ছিল মন তার,
বংশের গৌরবে প্রাণ কখনও হোত না তোলপাড়।

যাই হোক, অবশেষে ইয়েভ্গেনি পোঁছুল তার বাড়ি,
ভিজে কোট ঝেড়ে রাখল, পোশাক বদলাল, গেল শুতে।
কিন্তু শত চেষ্টাতেও কোনোমতে পারল না ঘুমুতে,
হাজারো চিন্তার ঢেউ মাথায় দাপাল বারবারই।
কিন্তু কোন চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল? — কী আবার!
যথা, সে দরিদ্র বড়; অন্য কোনো চাকরির যোগাড়
বড়ই কঠিন তার পক্ষে; তার কায়িক শ্রমের
ওপরে নির্ভর সুখ, ভবিষ্যৎ, ভরণপোষণ;
যেমন, ঈশ্বর ওকে দেন নি কো ঢেলে-মেপে ঢের
অর্থ ও সামর্থ্য; কিন্তু ভাগ্যের প্রসাদ অনুক্ষণ
পাচ্ছে যারা তারা কেউ যোগ্য নয় তার, না-বুদ্ধিতে,
না-সামর্থ্যে, কিছুতে না — অথচ কেমন পৃথিবীতে
লঘুপক্ষ জীবনের ডানায় দিয়েছে তারা ভর!
আর কেরানির কাজে কাটল কিনা দু'বছর ওর!
তারও পরে আরও দ্যাখো, শত্রুতা জুড়েছে যেন ঘোর
এমন কি আবহাওয়াও; ফেঁপে উঠছে নদী, অতঃপর
নেভার ওপরে যত সেতুপথ সব দেবে খুলে,
অর্থাৎ, প্রিয়ার সঙ্গ ক'টা দিন থাকতে হবে ভুলে —
প্রিয়তমা পারাশার সঙ্গে তার হবে না কো দেখা
দু'দিন কি তিনটে দিন — দ্যাখো কাণ্ড, থাকতে হবে একা!
দীর্ঘশ্বাস ফেলে আত্মসমাহিত কবির মতোই
স্বপ্নে ডুবে গেল, দিল কল্পনার রাশ আল্‌গা করে:

'আচ্ছা, সে কেমন হয় বিয়ে করলে? ছোট্ট বাসাঘরে
সংসার সাজালে?.. সত্যি, এ তো কাম্য অবশ্যই
আমাদের দু'জনেরই... মন্দ কিন্তু হয় না, যদিও
গোড়াতে কঠিন ঠেকবে — তবু এ-বয়সে সহনীয়
হয়ে যাবে উদয়াস্ত খাটা, ভুলব আড্ডা, মেলামেশা,
সবকিছু... একখানি ছোট্ট বাসা দু'জনার তরে

গড়ে তুলব, সেইখানে বাঁধবে ঘর আমার পারাশা...
অতঃপর কালক্রমে, বড়জোর একবছর পরে,
একবার সম্ভবমতো ভালো একটা চাকরি পেলে খুঁজে,
পারাশা নিজের মতো করে সব নেবে'খন বুঝে
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, মানুষ করার যত দায়...
শান্তমনে জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা পোহাব দু'জনে,
দু'জনে জীবনশেষে চলে যাব কবরশয়নে
সন্তানসন্ততি আর নাতিপুতি রেখে সমুদায়...'

এ-স্বপ্নে বিভোর ছিল ইয়েভ্‌গেনির মন। তবু তার
চিত্তে ছিল না কো সুখ, বাতাসের অশ্রান্ত বিলাপ
কেন-যে বিরতিহীন, কেন বৃষ্টিধারা বারংবার
অমন উতলা করে তুলছে তাকে -- তার পরিমাপ
পাচ্ছিল না কোনোমতে...
অবশেষে চোখে তন্দ্রালীন
নেমে এল ঘুম। আর দেখতে-দেখতে দুর্যোগের রাত
ফর্সা হয়ে এল, আলো উঠল ফুটে, হিম পাণ্ডু দিন
চোখ মেলে চাইল শেষে শহরের শিয়রে হঠাৎ...
ওহ্ সে কী ভয়ঙ্কর দিন!
সারা রাত্রি জুড়ে নেভা
প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে ছুটতে গিয়ে সমুদ্রের মুখে
প্রতিহত হয়েছে সে ঝড়ের প্রতাপে, যেন কেবা
চূর্ণ করে সকল প্রয়াস তার গতি দিল রুখে...
সকালে নদীর তীরে দলে-দলে জমে উঠল লোক,
দেখল, নেভা শত ফণা বিস্তার করেছে বিষধরী,
পর্বতপ্রমাণ তার ঢেউ খুলতে বাধার নির্মোক
প্রচণ্ড আঘাতে হানছে দুই তীরে ফেনিল লহরী।
বিরুদ্ধবাতাসে পথ রুদ্ধ বলে উপসাগরের
জলস্ফীত নেভা মুখ ফিরিয়ে সে প্রচণ্ড তর্জনে

বন্য ক্রোধে, তীব্র প্রতিহিংসাবশে ফিরে এসে ফের
প্লাবিত করেছে তার দ্বীপ একে-একে... ক্ষণে-ক্ষণে
বেড়ে চলল ঝড়ের তাণ্ডব, নেভা উন্মাদিনী-প্রায়
ফুলতে লাগল, ফুঁসতে লাগল, ফুটন্ত-সে দুর্বার ধারায়
হাঁ-মুখ হাসির ফেন-কুলকুচায় ভরে দিল হানা,
তারপর হঠাৎ যেন বন্যজন্তু, ক্ষিপ্ত, বে-ঠিকানা
ঝাঁপ দিল শহরের ঘাড়ে অতর্কিতে। তাড়া খেয়ে
পালাল সকলে, সবে উল্টোমুখে দৌড়ল, হঠাৎ
রাস্তাঘাট গেল শূন্য হয়ে — জলস্রোত দ্রুত হাত
বাড়াল, ভাসিয়ে দিল হর্ম্যতল, তীব্র বেগে ধেয়ে
এল নদী, এল খাল লৌহজাল ভেঙে ছাড়া পেয়ে,
শহর ডুবিয়ে যেন সমুদ্রদেবতা ট্রাইটন
কোমর-ডোবানো জলে জুড়ে দিল উদ্দাম নর্তন...

এ কী অবরোধ! এ কী আক্রমণ! কী উত্তাল ঢেউ
ঢুকে পড়ে জানলা দিয়ে অট্টরোলে, যেন দস্যু কেউ,
চূর্ণ করে শার্সি যত দড়িছেঁড়া নৌকোর আঘাতে।
যতদূর চোখ যায় দেখি জল বয়ে আনে সাথে
ভাঙাচোরা দোকানের ছাউনি, খুঁটি, তক্তা, দোকানীর
সযত্নসঞ্চিত পণ্য, সেতু একটা, দরিদ্রবাড়ির
অমূল্য সম্পদ বলতে যা বোঝায় — আসবাব, বাসন,
আস্ত যত কুঁড়েঘর, কবরখানার গুপ্তধন
মাটির গভীর থেকে শববাহী কফিনের সারি
এখন বেড়ায় ভেসে রাস্তাঘাটে!

বিভ্রান্ত মানুষ
অপেক্ষায় থাকে, ক্রোধী ঈশ্বরের অমোঘ অঙ্কুশ
কখন দংশাবে মৃত্যু! হায়, কোথা আশ্রয়, আহারই!
নিশ্চিত এ-সর্বনাশে কে বাঁচাবে?

সে-বছরে রুশ

দেশের গৌরব ফের জয় করে এনে শান্তমনে
ছিলেন সম্রাট। এই দৃশ্য প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে
স্বয়ং চাক্ষুষ করে শোকেদুঃখে মুহ্যমান, ডেকে
বললেন সবারে: "হায়, নেই কো জারেরও নিয়ন্ত্রণে
ঈশ্বরের এ-তাণ্ডবলীলা।" তিনি অলিন্দে দাঁড়িয়ে
চিন্তাক্লিষ্ট চোখ মেলে চারিদিকে বিপুল ধ্বংসের
অর্থহীন সে-তাণ্ডব বহুক্ষণ দেখলেন তাকিয়ে:
প্রাসাদ-চত্বর রূপ নিয়েছে সে বিশাল হ্রদের,
সুপ্রশস্ত রাজপথ যেন নদী — দূর সমুদ্রের
পানে তারা ধাবমান। প্রাসাদ নিঃসঙ্গ যেন এক
দ্বীপবিন্দু, বন্দী যেবা ধু-ধু জলমরুর বিস্তারে।
সম্রাট বলেন — হল যা হবার তা-ই, এবে যাক
সেনাপতি যত তাঁর কাছে আর দূরে রাস্তাপারে,
বাত্যাক্ষুব্ধ জলস্রোতে সন্ধান করুক চারিধার —
পথ যত দিক পাড়ি হেথা-হোথা বিপদসঙ্কুল —
কোথায় রয়েছে নরনারী গৃহবন্দী কি উন্মূল,
ভীতত্রস্ত, নিমজ্জিত — সবারেই করুক উদ্ধার।

পিটর-চত্বরপ্রান্তে, যেখানে সম্প্রতি পথ জুড়ে
মাথা তুলে উঠেছিল নতুন প্রাসাদ অল্প দূরে,
তারই তোরণের দুই ধারে দৃপ্ত প্রহরী-সদৃশ
ছিল দুই সিংহমূর্তি, প্রকাণ্ড, উদ্যত থাবা তুলে —
ইয়েভ্‌গেনি বন্যায় ভেসে ঠেকে-ঠেকে একূলে-ওকূলে
অবশেষে পৌঁছেছিল কাছে তার — টুপিহীন, কৃশ,
মুখে তার নেমেছিল মৃত্যু-পাণ্ডুরতা বিসদৃশ —
মর্মর-সিংহের একটি মূর্তিতে সওয়ার হয়ে সে-যে
বসেছিল স্তব্ধ ও অনড়। বিপদে পড়েছে নিজে,
তার জন্যে চিন্তা ছিল না কো ওর, বেচারি ইয়েভ্‌গেনি!

প্রচণ্ড মাতনে ঢেউ ফুঁসে উঠছে — চোখে তা পড়ে নি,
দেখে নি লোলুপ জল ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর পদতল,
বৃষ্টিধারা মুখে হানছে অন্তহীন প্রবল ঝাপট,
হাওয়ার চিৎকার কানে পশে নি কো, সে-যে করে ছল
মাথা থেকে টুপি ওর নিয়ে গেছে, বোঝে নি দাপট।
ও ছিল তাকিয়ে শুধু হতাশায় ভরা শূন্যচোখে
সামনে তার দিগন্তের একটিমাত্র বিন্দু লক্ষ্য করে
অচল, অনড়। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তবু ওকে
বিচলিত করে নি কো। খরস্রোতে তীব্র গর্বভরে
গ্রাস করে চলেছিল সবকিছু, তখনও ঝড়ের
গতি ছিল অব্যাহত, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঢের
ধ্বংসস্তূপ... ও ছিল তাকিয়ে যেথা সাগরের তীরে
উইলোর ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট একটি দরিদ্র-কুটিরে —
একেবারে সমুদ্রের ঢেউ ঘেঁষে ক্ষুদ্র এক ঠাঁই
পুরাতন, জীর্ণ বেড়া-দিয়ে-ঘেরা — রয়েছে সেথাই
বিধবা ও মেয়ে তার, সে-ই-মেয়ে যে ওরই পারাশা!
থাকে তারা দুই জনে সে-কুটিরে একান্ত একেলা...
হায়, হায়, ভগবান! এ কী স্বপ্ন, স্বপ্নের দুরাশা
দিল মায়াকাজল ও-চোখে? নাকি এ ভাগ্যের খেলা,
রসিকতা আমাদের পৃথিবীকে জীবনকে নিয়ে,
দিবাস্বপ্নে, শূন্যতায় সবকিছু দেয় যে ভরিয়ে?

যেন-বা সে মন্ত্রমুগ্ধ, শৃঙ্খলিত, দুনিয়া-খোয়ানো
একজন মানুষ — এমনি বসে রইল সেইখানে, যেন
কোনোদিকে দৃষ্টি নেই জলের বিস্তারে চোখ ছাড়া,
নড়াচড়া বন্ধ, উঠে দাঁড়াবে-যে হেন শক্তিহারা!
আর তার সামনে মাথা ঊর্ধ্বে তুলে একান্ত নির্ভীক
তুচ্ছ করে ফেনায়িত প্লাবনের রুদ্র জলধারা

ঝঞ্ঝার গর্জনও, সামনে প্রসারিত হাতের নিরিখ
স্থির রেখে, অশ্বারোহী বীরমূর্তি রইল নির্নিমিখ
ব্রোঞ্জের ঘোড়ার পিঠে গর্বোদ্ধত সওয়ার পাহারা।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অতঃপর ধ্বংসযজ্ঞ অবসিত হল অবশেষে।
হিংসার তাণ্ডব সেরে তৃষ্ণা আর ক্রোধ নিরসনে
প্রকৃতি নিরস্ত হল পরিশেষে শ্রান্তাক্লান্ত মনে,
আগ্রাসী নেভাও কাল কাটাল না বৃথা দস্যুবেশে,
যেন হিংসা কিছু নয় এমনি হেলাফেলাভরে হেসে
ফিরে গেল যথাস্থানে ছড়িয়ে লুণ্ঠিতদ্রব্য। যথা —
সঙ্গে নিয়ে দস্যুদল রাহাজান-সর্দার সর্বদা
হানা দেয় গ্রামাঞ্চলে, ঘিরে লুটে নেয় গ্রামটিকে,
চেঁচায়, বাপান্ত করে, ভাঙে, গুলি ছোড়ে দিগ্‌বিদিকে,
অতঃপর ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে অবসন্ন-প্রায়,
পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে
ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা অকস্মাৎ যায়-যে পালিয়ে,
লুণ্ঠিত বস্তুর সিংহভাগ পিছে ফেলে রেখে ধায়
আপনার প্রাণ নিয়ে আস্তানার নিশ্চিন্ত উদ্দেশে।

ক্রমে ক্রমে নেমে গেল প্লাবনের জল — বুঝে শেষে
সিংহাসন থেকে দ্রুত নেমে খালি ইয়েভ্‌গেনি তাকায়
চারিদিকে — যে-দৃশ্য দেখে সে তাকে একান্ত অক্লেশে
অর্ধসত্য বলে ঠেকে। আশা আর আশঙ্কাতাড়িত
ছোটে সে — যেখানে নদী নিজ খাতে ফিরে প্রবাহিত
হচ্ছে, তবু রুষেফুঁসে জয়গর্বে উদ্ধত অস্থির,
তখনও দুর্মদ ক্রোধ মানে নি কো শাসন শান্তির,
যেন-বা হৃদয়ে তার অগ্নিশিখা চির-উৎসারিত;

মুখে ফেনা তুলে নেভা করে খালি এপাশ-ওপাশ,
ফোঁপায়, শাসায়, ভুল বকে, ঘনঘন ফেলে শ্বাস —
রণক্ষেত্র থেকে যেন বল্‌গাছেঁড়া অশ্ব উপনীত।
ইয়েভ্‌গেনি তাকায় চারিদিকে, খোঁজে নৌকো একখান,
দূরে নৌকো দেখতে পেয়ে পা চালায় উন্মাদ-সমান,
নৌকোর মাঝিকে ডেকে বলে যেতে চায় সে ওপারে —
খেয়াপার করতে রাজি হয়ে যায় মাঝি বেপরোয়া,
দশ কোপেকের বিনিময়ে নেয় নৌকোয় সওয়ার,
ঢেউ ঠেলে ছোটে নৌকো ভয়ঙ্কর বেগে স্রোতধারে।

উত্তাল ঢেউয়ের সাথে বহুক্ষণ যুদ্ধে থেকে রত
অভিজ্ঞ নিপুণ মাঝি দাঁড় বেয়ে নৌকো সে চালালে,
মাঝে-মাঝে মনে হল ঢেউ বুঝি হয়েছে উদ্যত
গ্রাস করে নিতে নৌকো — যেই নৌকো নেমে হল নত
দু'পাশে ঢেউয়ের চুড়ো রেখে মধ্যিখানে নিচু ঢালে।
অবশেষে নৌকো ভেড়ে পরপারে।

আতঙ্কে বিস্ময়ে
ইয়েভ্‌গেনি তাকায় চারিদিকে, কোথা দেখতে সে না পায়
সেইসব পরিচিত রাস্তাঘাট, গেল তা কোথায়!
সকলই অপরিচিত ঠেকল তার কাছে। ভয়ে-ভয়ে
ভাবল, সে কী ভুল করছে? এ-যে ধ্বংসে-ভরা চতুর্দিক:
ইতস্তত ঘরবাড়ি মিশেছে মাটিতে, ততোধিক
নুব্জ হয়ে ঝুঁকে আছে ভাঙা জানলা মুক্তদ্বার নিয়ে,
ভিত্তি থেকে উপড়ে কিছু হেথা-হোথা রয়েছে ছড়িয়ে,
যেন তারা রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত মৃতদেহ। রুখে
ইয়েভ্‌গেনি দৌড়ল অর্ধ-উন্মাদের মতন সম্মুখে
এ-রাস্তা সে-রাস্তা ধরে, কোন রাস্তা চেয়েও দেখল না,
দৃক্‌পাত না-করে কিছু বুকে বয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা
ছুটে চলল সেই ঠাঁয়ে, যেথা ভাগ্যলিপির জল্পনা

অপঠিত রয়ে গেছে তখনও — পাঠক একজন৷
ইয়েভ্‌গেনির অপেক্ষায়। হায়, ভাগ্য প্রতীক্ষানিরত!
ভালো হোত যদি রাখত সে-সংবাদ চির-সংগোপনে,
কিন্তু তা হবার নয়... শহরতলিতে পৌঁছে কত
খুঁজে ফিরল ইতস্তত ব্যাকুল ইয়েভ্‌গেনি সন্তর্পণে।
ধূসর নির্জন উপসাগর এলিয়ে — কে কোথায়!
সে-কুটির এখানেই ছিল তো, এখন... হায়, হায়,
সে কোথায়? কে কোথায়?..

পায়ে-পায়ে সরে এল ও-সে,
ফের দুর্নিবার টানে পড়ি-মরি ওখানে গেল সে।
এই তো সেই জায়গা, সেই-ই জায়গা! সেই উইলোগাছ খাড়া
তেমনই রয়েছে... তবে বাড়িখানা, বাড়িঘেরা বেড়া
কোথায়? গেল কি ধুয়েমুছে বন্যাজলে?.. অপলক
হেঁটে সে বেড়াল চতুর্দিক... অকস্মাৎ এলোমেলো
অসংলগ্ন ক'টি কথা, থেকে-থেকে হাসির দমক
চূর্ণ করল নীরবতা...

ভাগ্য ভালো, সন্ধ্যা নেমে এল।
রাত্রি এসে ধ্বস্ত নগরীকে ধীরে কৃষ্ণ আচ্ছাদনে
দিল ঢেকে। তবু কিন্তু শহরবাসীর কারও মনে
ঘুমের সামান্য ইচ্ছা জাগে নি কো, জেগে রইল সবে।
নামাতে চাইছিল লোকে নিরন্তর কথায় সরবে
হৃদয়ের গুরুভার — সেই দুঃখদিনের দুর্ভোগ
সবিস্তার বর্ণনায়...

যখন ভোরের সূর্যালোক
বিবর্ণ মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল হাসি-হাসি মুখে,
সে তবে ধ্বংসের চিহ্ন রাখল যেন ঢেকে লীলাভরে
ভোরের রক্তাভ মোহ-আবরণে কী-এক কৌতুকে,
অভিশপ্ত গতদিন — স্বপ্ন হেন মনে হল তারে।
জীবন সচল হল, বয়ে চলল ফের শতধারে।

পথে-পথে নেমে এল শহরবাসীরা পুনর্বার,
দ্রুত পা চালাল তারা নিজ-নিজ কাজে নির্বিকার
নিশ্চিন্ত আগের মতো। অত ভোরে পথে দিল দেখা
দোকানি ও ফেরিওলা দলে-দলে, কিংবা একা-একা.
অফিস-কেরানিকুল। অসমসাহসী দোকানিরা
এতটুকু মুহ্যমান না-হয়ে নেভার তীরে যত
খুলে দিল দোকান তাদের, যাতে তাড়াতাড়ি কত
সব ক্ষতি পূর্ণ করে নিতে পারে, সব মনঃপীড়া
দূর করে ক্রেতার অর্থের 'পরে দস্যুবৃত্তি সেরে।
কাউন্ট খ্‌ভস্তোভ, কবি, দেবতার প্রিয়, সে-ও ফেরে
গেয়ে গান — স্বরচিত মর্মভেদী সঙ্গীত অমর:
নেভার উৎপাতে কী-যে মহাদুঃখে পিটর-নগর
নিপতিত!

আর আমাদের সেই বেচারা ইয়েভ্‌গেনি,
তার কথা কী-বা বলি! শোকে-দুঃখে, প্রচণ্ড আঘাতে
সেই-যে বুদ্ধিনাশ হল, পরে আর সুস্থতা ফেরে নি;
স্বাভাবিক হল না সে। একা-একা শহরে রাস্তাতে
উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াল সে দিন-পরে-দিন —
ঝড়ের গর্জন আর নেভার চিৎকার কানে নিয়ে,
অনামা আতঙ্কে আর দুর্বহ চিন্তার ভারে লীন,
দুঃস্বপ্নের কশাঘাতে ত্রস্তব্যস্ত। সপ্তাহ পেরিয়ে
আরেক সপ্তাহ এল, দেখতে-দেখতে মাস গেল কেটে,
তবু সে দিনের-পর-দিন চলল শুধু রাস্তা হেঁটে
অকারণে, উদ্দেশ্যবিহীন। রইল তাকে বেড়া দিয়ে
নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, বিমর্ষতা। ফিরে সে গেল না ঘরে
নিজ বাসাবাড়িতে কখনও। আর কিছুদিন পরে
নতুন ভাড়াটে এল সে-বাসায়, দীন এক কবি।
ইয়েভ্‌গেনির মনে কভু এ-কথার হল না উদয় —
সে-বাসায় আছে তার ব্যক্তিগত যাবতীয় সবই,

একবস্ত্রে রয়ে গেল সে-যে। ক্রমশ অপরিচয়
বেড়ে গেল জগতের সঙ্গে তার, ক্রমেই সুদূর
হয়ে গেল ইয়েভ্‌গেনি মোদের। পথে অক্লান্ত হাঁটায়
কেটে যেত দিন, রাতে ঘুমোত সে জাহাজঘাটায়।
করুণ অবস্থা হল তার — ছিন্নবেশ, ক্ষুধাতুর,
জীবনধারণ চলত পথিকের দাক্ষিণ্যে যা-কিছু
খাদ্য জুটে যেত তাতে। রাস্তার ছেলেরা দূর-দূর
করত, ঢিল ছুড়ত, তাড়া করে ধেয়ে আসত পিছু-পিছু।
হামেশা চাবুক পড়ত পিঠে, কেননা চলন্ত গাড়ি
না-দেখে খেয়ালমতো রাস্তা পার হোত শূন্যমনা,
ওর কাছে পৃথিবীতে কারও কোনো অস্তিত্ব ছিল না,
ও খালি পালাতে চাইত যন্ত্রণার হাত থেকে — তারই
আঘাতে জর্জর হয়ে, অন্ধ ও বধির। হেনমতো
জীবন আছিল ওর জীবনযন্ত্রণা রক্তক্ষত —
না-মানুষ না-পশুর, না-প্রেতলোকের, আর তা-ও
জীবন্ত আত্মার প্রাণযাত্রা ছিল না কো...

একদিন

স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম যবে যাই-যাই করছে সে-কোথাও
হেমন্ত আসন্ন বলে, ইয়েভ্‌গেনি আছিল ঘুমে লীন
জাহাজঘাটার ধারে। নেভা ঢেউ তুলে অন্তহীন
আর্তকণ্ঠে জানাচ্ছিল কী-এক মিনতি বারে বারে
ঘাটের সিঁড়ির গায়ে ছলচ্ছল আঘাতে সে-কারে।
যেন-বা কঠিনপ্রাণ বিচারকর্তার দ্বারে এসে
দীন আবেদনকারী আকুল কান্নায় ভেঙে ভেসে
জানাচ্ছিল নিষ্ফল বিনতি। ঘুম ভাঙল ইয়েভ্‌গেনির,
চারিদিক অন্ধকার: দেখল বৃষ্টি ঝরছে ঝিরিঝির,
বাতাস ব্যাকুল হাঁকে হেমন্তের গাইছে আগমনী,
দূরে প্রহরীর হাঁকে যেন তার মিলল প্রতিধ্বনি
রাত্রিকে বিদীর্ণ করে... দ্রুত উঠে পড়ল শয্যা ছেড়ে,
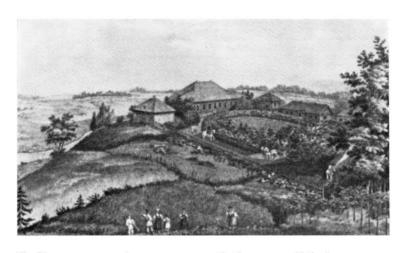
মিখাইলোভ্স্কোয়ে, পুশকিনের মাতার মহাল। নির্বাসনে এখানে তিনি ছিলেন দু'বছরের বেশি।

আরিনা রোদিওনোভ্না (১৭৫৮-১৮২৮), পুশকিনের আয়া। অক্ষরপরিচয়হীন কিন্তু স্বতই গুণী এই রুশী নারী জানতেন অনেক লোকগীতি, কিংবদন্তি, রূপকথা। পুশকিন তাঁর রচনায় সেগুলির কিছু কিছু কাজে লাগিয়েছেন। বাস-রিলিফ, ১৮৪০-এর দশক

১৮২৬ সালে মিখাইলোভ্‌স্কোয়েতে কবি সান্নিধ্যে ইভান
পুশিান। গ্রে অঙ্কিত চিত্র, ১৮৭৫
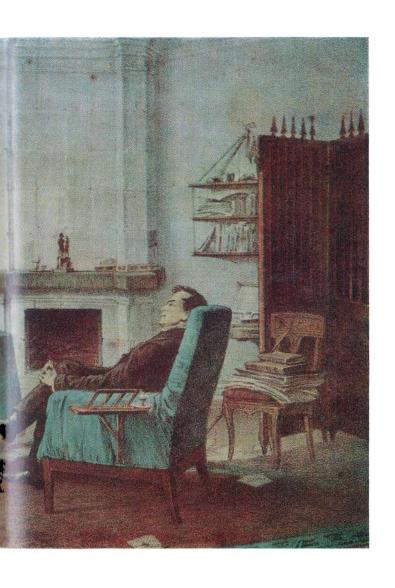
আন্না কের্ন (১৮০০-১৮৭৯)। পুশকিন নিজের একটি অতি আবেগস্পন্দিত কবিতা লিখেছেন তাঁর উদ্দেশে। পুশকিনের নিজের ড্রয়িঙ, ১৮২৯
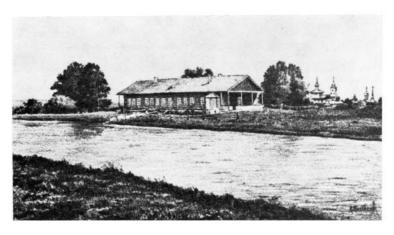
মিখাইলোভ্স্কোয়ের পাশে ত্রিগর্স্কোয়েতে অসিপভ্দের গৃহ। পুশকিন তাঁর বন্ধু অসিপভ্দের কাছে প্রায়ই আসতেন এখানে।

কোথায় আছে সে, কী-যে হচ্ছে কিছু বুঝতে নাহি পেরে;
অতীত দিনের সেই বিভীষিকা শুধু তার মন
রেখেছিল ঘিরে, চোখে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অগণন...
দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্যে পড়ি-মরি দিল দৌড় কষে,
থেমে গেল অকস্মাৎ, দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফার,
বীভৎস বিকৃত হয়ে উঠল মুখ তীব্র ভয়ে, ও-সে
যে-দৃশ্য চোখের সামনে দেখল সে-যে অদ্ভুত ব্যাপার।
দেখল: এক রাজপ্রাসাদ, অগণন স্তম্ভ সারি-সারি,
দেউড়ির দু'পাশে তার উঁচু পাদপীঠ, 'পরে তারই
প্রস্তর-সিংহের দুই মূর্তি সমুদ্যত। কাছে তার
উচ্চ শিলাখণ্ড 'পরে, শৃঙ্খল-বেষ্টনী পেরোলেই,
একটি হাত প্রসারিত ভয়ঙ্কর দেবমূর্তি সেই —
ব্রোঞ্জের ঘোড়ার পিঠে সমাসীন উদ্ধত সওয়ার।

শিউরে উঠল ইয়েভ্‌গেনি-সে। আবার নতুন করে তাকে
পেয়ে বসল আগেকার মর্মঘাতী যন্ত্রণার জের।
স্বচ্ছ, স্বাভাবিক মনে দেখল ফের পুরনো দিনের
সেই সর্বনাশা ঢেউ তেড়ে আসছে, বাঁধছে পাকে-পাকে,
গর্জিয়ে কানের কাছে, ফণা তুলে। চিনে নিল: সেই
প্রাসাদ-চত্বর, দেউড়ি, দ্বাররক্ষী সিংহদুটিকেই,
আর তাঁকে — যিনি রয়েছেন ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে,
অন্ধকার পায়ে দলে, অচঞ্চল মৌন সমুদ্ধত,
সে-মহামহিমান্বিত, ভবিতব্য যাঁর পদানত,
নগরপত্তন যিনি করেছেন সমুদ্রের কূলে...
রাত্রি-অন্ধকারে তিনি দৃশ্যমান ভয়ঙ্কর রূপে!
কী গভীর চিন্তান্বিত, দুরস্বপ্নে রয়েছেন ডুবে!
মূর্তিতে নিহিত কী-যে দুর্নিবার শক্তির আবেগ!
আর তাঁর ব্রোঞ্জ-অশ্ব, তারও চোখে স্ফুলিঙ্গ অগ্নির!
ওরে অশ্ব, কোথা যাস, কতদূর, উদ্দাম অধীর?

কোনখানে অশ্বারোহী রুখে দেবে ও-বিদ্যুৎবেগ?
ওগো সর্বশক্তিমান মহারাজ, হে ভাগ্যবিধাতা!
অমনই চালনা তুমি করলে লৌহবল্গার শাসনে
মোদের এ-রুশদেশ, সকল বিপদ উল্লম্ফনে
পার হয়ে সমুত্তীর্ণ করে দিলে তাকে, পরিত্রাতা!

পায়ে-পায়ে এল চলে হতভাগ্য অসুস্থ ইয়েভ্‌গেনি
শিলা-পাদপীঠ তলে, ব্রোঞ্জ-অশ্বারোহীর সমীপে,
সভয়ে সে বারবার দেখল চেয়ে অধীশ্বর নৃপে,
যাঁর পদপ্রান্তে ছিল অর্ধেক জগৎ হার ম্যানি'।
শ্বাস বন্ধ হয়ে এল ইয়েভ্‌গেনির। বেড়ার জালিতে
চেপে ধরল নিজের উত্তপ্ত মুখ, তবু ধমনীতে
আগুন ছড়াল রক্তে, হৃৎপিন্ড উন্মাদ দ্রুততালে
বেজে চলল। থরথর কম্পমান, মুঠিবদ্ধ হাত,
উদ্ধত ও ক্রুদ্ধদৃষ্টি দেবমূর্তি-পানে অকস্মাৎ
সব ভুলে পাগলের মতো চোখ তুলে সে তাকালে।
যেন সম্মোহিত, নিশি-পাওয়া, সোজা ইয়েভ্‌গেনি দাঁড়াল
মূর্তির সম্মুখে, আর দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধভরে
তাঁকেই উদ্দেশ করে বলে সে স্খলিত রুদ্ধস্বরে,
'হে নির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা, বেশ-বেশ, ভালো, খুব ভালো!
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!..' এই ক'টি কথা অগোছালো
কেবল বেরুল তার মুখ দিয়ে, আতঙ্কে বিহ্বল
অতঃপর পিছু ফিরে পালাল সে: জার রুষ্টমুখে
তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে... সেই দৃষ্টির সম্মুখে
যেন ঝঞ্ঝাতাড়িত সে ছুটে চলল অস্থির চঞ্চল
পদক্ষেপে। পার হয়ে জনশূন্য প্রাসাদ-চত্বর
দৌড়ল ইয়েভ্‌গেনি, আর শুনতে পেল যেন মন্দ্রস্বর
পিছে তার, বারংবার অট্টরোল, গর্জন বজ্রের,
মনে হল নিচে তার কাঁপছে মাটি তেজস্বী অশ্বের

রুদ্র পদদাপে। কে-ও আসে? বুঝি আসে পিছুপিছু
অন্ধকারে, চাঁদের ভৌতিক আলো গায়ে মেখে কিছু,
শাসনভঙ্গিতে একটি হাত তুলে তর্জনী উঁচিয়ে
সারা রাত্রি ছুটে আসে ব্রোঞ্জ-অশ্বারোহী ভয়ঙ্কর।
সারা রাত্রি অশ্বক্ষুর বেজে যায় স্বস্তিও ঘুচিয়ে।
পালাল ইয়েভ্গেনি, সারা রাত্রি কানে নিয়ে খরতর
সেই শব্দ, সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি — যেখানে, যখন
পালাল সে — পিছে রইল ব্রোঞ্জ-অশ্বারোহী নিরন্তর,
নিরন্তর সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি, পশ্চাদ্ধাবন।

আর তার পর থেকে যখনই সে দিক্‌চেতনাহীন
এদিক-ওদিক যেতে এসে পড়ত প্রাসাদ-চত্বরে,
তখনই কেমন যেন বিভ্রান্ত, অস্থির হোত দীন
মানুষটা, থমকে যেত সঙ্কোচে সত্রাসে দ্বিধাভরে।
হাতদুটো উঠে আসত বুকের ওপর, বুঝি তার
বুকের তোলপাড় চাপা দিতে, ফুটে উঠত মুখে তার
অসহায় বিপন্নতা; মাথা থেকে শতচ্ছিন্ন টুপি
খুলে নিয়ে, সসঙ্কোচে চোখ নিচু করে চুপিচুপি
সরে পড়ত সে-তল্লাট ছেড়ে।

সমুদ্রতীরের কাছে
ছিল ছোট্ট দ্বীপ এক। দিনান্তে সেখানে কোনোদিন
জেলেদের কেউ মাছধরায় বিফল হয়ে দীন
নৌকো তার ভেড়াত বালির চরে, আর মাঝে-মাঝে
সন্ধ্যা-গোধূলির স্বল্প আলোয় রান্নার কাজ সেরে
সামান্য আহার্য কিছু মুখে তুলত, কিংবা ঘর ছেড়ে
সপ্তাহান্তে আসত সেথা আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি
ছুটির বনভোজনে। দ্বীপে ছিল না কো বৃক্ষলতা,
ঝোপঝাড়, এক-চিল্‌তে ঘাসও। শুধু কীভাবে না-জানি
বন্যার প্রবল তোড়ে একখানি কুটির একদা

ভেসে এসে ঠেকেছিল দ্বীপের মাটিতে। ওখানেই
ছিল সেটা বসন্ত অবধি, পরিত্যক্ত, ঝড়ে-ভাঙা
গাছের মতন, পরে বসন্তের বন্যার টানেই
ফের ভেসে গেল কোথা — হয়তো খুঁজে অন্য কোনো ডাঙা।
আর দেখা গেল, সেই কুটির যেখানে ছিল পড়ে
বন্যা-ক্ষতচিহ্নে ভরা নষ্টভ্রষ্ট দেহ নিয়ে তার —
মরে আছে তারই পাশে হতভাগ্য পাগল আমার;
(আত্মা তার শান্তি পাক!) সেখানেই শুল সে কবরে।

(১৮৩৩)

নাটক

মোৎসার্ট ও সালিএরি*

প্রথম দৃশ্য

[কক্ষাভ্যন্তর]

সালিএরি

লোকে বলে এই বিশ্বে ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই।
কিন্তু পরলোকেই-বা সুবিচার কই? — মন বলে
এই-ই সত্য একমাত্র তুলাদণ্ডসম প্রাথমিক।
সঙ্গীতের সুগভীর আকর্ষণ নিয়ে জন্ম মোর;
যখন নেহাত শিশু তখনও শুনতাম দেশে-গাঁয়ে
সুপ্রাচীন গির্জাঘরে অর্গ্যান-সঙ্গীত সুগম্ভীর,
শুনতে-শুনতে মগ্ন হয়ে যেতাম — ঘনাত চোখে জল
বিশুদ্ধ আনন্দে আপনা থেকে অশ্রুধারা যেত বয়ে।
অলস আমোদ যত শিশুকাল থেকে গেছি ভুলে,
সঙ্গীত ব্যতীত আর যত জ্ঞান-বিজ্ঞান সকলই
থেকেছে অপরিচিত মোর কাছে; সগর্ব নিষ্ঠায়
সঙ্গীতে নিজেকে সঁপে ফিরিয়ে নিয়েছি মোর মুখ
আর সবকিছু থেকে। প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল
সুকঠিন, পথের সূচনা ছিল নিঃসঙ্গ, বিজন।
প্রারম্ভের ঝড়ঝঞ্ঝা সামাল দিয়েছি। কারুশৈলী
গড়েছি নিখুঁত করে যাতে কলালক্ষ্মী পাদপীঠ
পান সুকোমল। কারুশিল্পী আমি: দশটি আঙুলে
এনেছি শৃঙ্খলা, শুষ্ক স্বাচ্ছন্দ্যের গতি, দুই কানে
যথাযথ সুরবোধ বেঁধে দেছি। সঙ্গীতের দেহে

মৃতদেহ-যথা অস্ত্রোপচার করেছি, দেখিয়েছি
উচ্চতর গণিতের মতো সুর-সঙ্গতি নির্ভুল।
একমাত্র এরপরই — গীত-তত্ত্বে সুশিক্ষিত আমি
সঙ্গীত-সৃষ্টির মতো দেবসাধ্য দুরূহ প্রয়াসে
মেতেছি। হয়েছে শুরু সৃষ্টিকর্ম; তবে তা গোপনে,
সুনির্জন একাকিত্বে; খ্যাতি — সে তো ছিল দূরস্থান,
তার কথা ভাবতে পারি হেন স্পর্ধা আছিল না মনে।
মাঝে-মাঝে এমনও হয়েছে যবে একা-একা বসে
কাটিয়েছি দুটো-তিনটে দিন, অন্নজল নিদ্রা ভুলে
অশ্রুজলে ভেসে গিয়ে, তুরীয় আনন্দে প্রেরণার;
অতঃপর সে-রচনা অগ্নিতে করেছি সমর্পণ,
নিস্পৃহ দেখেছি মোর ভাবনা ও শ্রমলব্ধ সুর
কেমন দাউদাউ জ্বলে ধূম্রজালে গেছে শূন্যে মিশে।
শুধুই কি তাই? যখন প্রতিভাধর শিল্পী গ্লুক
নব-নব রহস্যের সন্ধান দিলেন আমাদের
(আর সে রহস্য কিবা অতল, অপার, চিত্তজয়ী!)
তখনও কি পূর্বশিক্ষা মন থেকে মুছে ফেলি নি কো,
যা ছিল আমার প্রিয়, আমার নির্ভর — সবকিছু?
হই নি কি আমি তাঁর পদাঙ্কের মুগ্ধ অনুসারী
বিনা প্রতিবাদে, যথা পথভ্রান্ত পান্থ নেয় মেনে
পথের নিশানা জানে হেন বিজ্ঞ সঙ্গীর নির্দেশ?
অধ্যবসায়ীর দৃঢ় নিষ্ঠা নিয়ে, অক্লান্ত প্রয়াসে
শিল্পের অনন্ত পথযাত্রী আমি পেনু অবশেষে
সাফল্যের উচ্চ চূড়া। মুখ তুলে তাকিয়েছে খ্যাতি
প্রসন্ন, সহাস; মোর সুর-মূর্ছনারা ক্রমে-ক্রমে
পেল সাড়া, প্রতিধ্বনি তুলল তারা মানব-হৃদয়ে।
আমিও হয়েছি সুখী: ভরেছে প্রসন্ন সুখে মন
সৃষ্টিকর্মে, সাফল্যে, খ্যাতিতে, হয়েছি কত-না সুখী
সফল হয়েছে যবে সৃষ্টিকর্ম মোর বন্ধুদের

সহকর্মীদের মোর, যারা রম্য শিল্পের সেবক।
না, কভু জানি নি ঈর্ষা কারে কয়, কিবা তার দাহ,
কখনও না! এমন কি পিচ্চিনি যখন নেন জিনে
বর্বর পারি-র প্রাণ কানে মধু ঢেলে — তখনও না।
যখন প্রথম শুনি 'ইফিগেনিয়া'র* দিব্য সুর,
আমার গুরুর সেই মহৎ সৃষ্টির — তখনও না।
কেবা বলতে পারে হেন কথা — দৃপ্ত সালিএরি কভু
সবথেকে ঘৃণ্য পাপে কোনোদিন মজেছে কোথাও?
অক্ষম ঈর্ষা যে-পাপ, পিচ্ছিল, দুর্বল, পদানত,
ধূলিভুক সর্পসম তুচ্ছ যাহা দীপ্ত রাজপথে?
না, কেউ বলে না!.. তবু আজ নিজেই কবুল করি —
আজ আমি ঈর্ষাতুর। জ্বলে মরছি তীব্র, মর্মঘাতী
প্রচন্ড ঈর্ষায়। — ওগো দিব্যলোকবাসী ন্যায়াধীশ!
এখন কোথায় তুমি — যখন সে-শক্তি অলৌকিক,
অমর প্রতিভা এসে আশীর্বাদে ধন্য করে না কো
আকুল প্রেমিকজনে? তপঃক্লিষ্ট একান্ত ভক্তেরে?
শ্রম, রাত্রিজাগর সাধন নাহি হয় পুরস্কৃত?
অথচ আসঙ্গলিপ্সু, অবিবেকী উন্মাদের শিরে
জ্যোতির্বলয় দেয় সে-ই — আহ্, মোত্সার্ট, মোত্সার্ট!

মোত্সার্টের প্রবেশ]

মোত্সার্ট

আরে, আমায় ফেলেছ বুঝি দেখে! আমি ভাবছিলাম
তোমাকে চমক দেব, যা শোনাব না-হেসে পারবে না।

সালিএরি

আরে, তুমি! — কখন এলে হে?

মোত্‌সার্ট

এইমাত্র। কিছু-একটা
তোমাকে দেখাব বলে এখানেই আসছিলাম — পথে
সরাইখানার সামনে আসতে একটা বেহালার ক্যাঁ-কোঁ
কানে বিঁধল মারাত্মক... ওহ্‌, না-না, বন্ধু সালিএরি!
জীবনে কখনও তুমি শোন নি এমন সুর ভাঁজা,
এত হাস্যকর... অন্ধ বেহালা-বাজিয়ে সরাইয়ের
প্রচণ্ড কসরত করে বাজাচ্ছিল 'ভোই কে সাপেতে'!*
লোকটিকে সঙ্গে করে তাই আর না-এনে পারি নি
তোমাকে শোনাতে তার অপূর্ব-সে শিল্পের নমুনা।
এস, এস!

বেহালা-হাতে এক অন্ধ বৃদ্ধের প্রবেশ]

এবার বাজাও দেখি মোত্‌সার্ট একটুকু।

[বৃদ্ধ 'দোন জুয়ান' থেকে একটি আরিয়া-সঙ্গীতাংশ বাজায়।
শুনতে-শুনতে মোত্‌সার্ট হেসে অস্থির হন]

সালিএরি

এতে এত হাসি পাচ্ছে তোমার?

মোত্‌সার্ট

হায় রে, সালিএরি!
না-হেসে কি পারা যায়, বল তুমি?

সালিএরি

খুব সহজেই।
আমার পায় না হাসি অক্ষম চিত্রীকে দেখি যবে
চেষ্টা পাচ্ছে রাফায়েল-'ম্যাডোনা'র নকলিয়ানার।
মোটেই পায় না হাসি যখন ইতর পদ্যকার

কু-অনুকরণে করে দান্তে-র স্মৃতিকে অপমান।
আচ্ছা, বুড়ো, যেতে পার।

মোত্‌সার্ট

একমিনিট, পয়সা-ক'টা ধর,
স্বাস্থ্যপান কোরো মোর, বুঝেছ ইয়ার।

[বৃদ্ধের প্রস্থান

সালিএরি,

তোমার মেজাজ দেখছি বিগড়ে আছে। আজ তবে চলি,
আসা যাবে আরেকদিন।

সালিএরি

কিন্তু কী-যে দেখাবে বলছিলে?

মোত্‌সার্ট

ও কিছু না, তুচ্ছ ক'টা স্বরলিপি। সেদিন রাত্তিরে
কিছুতেই আসছিল না ঘুম — পুরনো অনিদ্রা আর-কি —
দুটো-তিনটে ভাব তাই গুন্‌গুনিয়ে উঠল মনে-মনে।
সেগুলো ধরেছি আজ স্বরলিপি ছ'কে। চাইছিলাম —
তুমি যদি সে-সম্বন্ধে মতামত দিতে, কিন্তু দেখছি
তোমার মেজাজ নেই আজ।

সালিএরি

আহ্‌, মোত্‌সার্ট, মোত্‌সার্ট!

আমার মেজাজ নেই তোমার সঙ্গীত শোনবার?
কী-যে বল! বোসো; শুনছি।

মোত্‌সার্ট
[পিয়ানোর পাশে বসে]

ধরে নাও... কেউ একজন...
আমিই, ধরতে পার — বয়েসটা আরেকটু কম ধর;
প্রেমে পড়ে গেছি — তবে গভীর না, হাল্‌কা আকর্ষণ;
পাশে মোর সুন্দরী, কি বন্ধু কেউ বসে — ধর, তুমি,
দারুণ মেজাজে আছি... হঠাৎ দেখলাম অন্ধকার,
ভেসে উঠল কবরের দৃশ্য এক, কিংবা অমনি কিছু...
যাক গে, বরং শোনো...

[বাজাতে লাগলেন]

সালিএরি
এমন জিনিস সঙ্গে নিয়ে
পথে আসতে তুমি কিনা থেমে পড়লে সরাইখানায়
অন্ধ বুড়ো বাজিয়ের বেহালা শুনতেই!.. হা ঈশ্বর!
মোত্‌সার্ট, তুমি তো দেখি নিজেই নিজের যোগ্য নও।

মোত্‌সার্ট
পছন্দ হয়েছে তবে?

সালিএরি
কী-যে বলি, কত গভীরতা!
কী দুঃসাহস আর গীতিরূপে কী সুর-সঙ্গতি!
মোত্‌সার্ট, দেবতা তুমি, অথচ নিজেই জান না তা;
সে শুধু আমিই জানি।

মোত্‌সার্ট
সত্যি! তা-ই ভাবো? হয়তো তাই...
এদিকে দেবতাটি-যে খিদেয় অস্থির — খানা চায়।

সালিএরি

শোনো বলি: চল, আজ দুজনে একসাথে খানা খাই।
'স্বর্ণ সিংহ' দিব্যি কেতাদুরস্ত সরাই।

মোত্সার্ট

তা-ই ভালো;
মনে হচ্ছে, জমবে বেশ। তবে কিন্তু আগে বাড়ি যাব,
স্ত্রীকে বলে আসতে হবে দুপুরের খাওয়া দেব ফাঁকি,
বাইরে খাব আজ।

[প্রস্থান

সালিএরি

তোমার আশায় থাকব; ভুলো না কো।

না! কিছুতে পারব না কো রোধ করতে সেই ভাগ্যলিপি,
যে-ভাগ্য আমার হাতে নির্ধারিত হবে; এ-আমার
দায়: ওকে শুদ্ধ করা। তা না হলে আমরা-যে সবাই —
সঙ্গীতের স্রষ্টা, হোতা, অনুষ্ঠাতা লুপ্ত হব সবে।
খ্যাতির সামান্য অংশী শুধু আমি মরব তা-ই নয়...
মোত্সার্টের বেঁচে থেকে কিবা লাভ? লাভ কী, যদি সে
স্পর্শ করে নিত্য নব অকল্পনীয়-সে তুঙ্গশৃঙ্গ?
তাতে কি সঙ্গীত পাবে উচ্চ মান? মোটেই তা নয়;
মৃত্যু তার সঙ্গীতেরে পুনর্বার করবে নিম্নগামী,
কারণ সে রেখে যাবে না কো যোগ্য উত্তরসাধক।
তাহলে কী তার প্রয়োজন? জ্যোতির্ময় দেবশিশু-
সম দিব্য সঙ্গীতের পশরা নিয়ে সে নেমেছে-যে
আমাদের মতো দীন ধূলির সন্তানদের মন

অপ্রাপ্যের আকাঙ্ক্ষায় ভরে দিতে — ফের সে পালাবে!
তা-ই যদি হয় তবে পালাও মোত্সার্ট! যাও দ্রুত।

এই সেই বিষ, মোর আইজোরার শেষ উপহার।
আঠারো বছর আমি কাছছাড়া করি নি কো এরে —
আয়ুষ্কালে কতবার জীবন-যে অসহ্য আঘাতে
করেছে বিক্ষত; কতবার করেছি-যে খানাপিনা
অসতর্ক, নিরুদ্বেগ শত্রু সামনে নিয়ে একসাথে,
তবুও কখনও আমি প্রচণ্ড লোভের কানাকানি
কানে নিই নি কো — তবু কাপুরুষ নই কোনোকালে,
আঘাত সম্পর্কে তবু স্পর্শকাতরতা নয় কম,
জীবনও আমার কাছে স্বল্পমূল্য, তবু। প্রতীক্ষায়
রয়ে গেছি। মৃত্যুচিন্তা উৎপীড়িত করেছে যখন,
ভেবেছি, মরি-বা কেন? হয়তো-বা এখনও জীবন
অচিন্তিত পুরস্কারে ধন্য করে দেবে আমাকেই;
তুরীয় আনন্দে মন হয়তো-বা উজ্জীবিত হবে,
দেখা দেবে স্বপ্নাবেশ, প্রেরণার জাগ্রৎ রাত্রিও;
এমনও তো হতে পারে নতুন হাইড্‌ন এসে কানে
মহৎ সঙ্গীত-সুধা ঢেলে দেবে আনন্দ অপার...
কিংবা ঘৃণ্য অতিথির সাথে পান-ভোজনের কালে
হয়তো ভেবেছি দেখা মিলতে পারে আরও মারাত্মক
কোনো দুশ্‌মনের; আরও সাংঘাতিক আঘাত হয়তো
ভূপাতিত করতে পারে উদ্ধত এ-মঞ্চ থেকে মোরে —
এবং তখনই কাজে আসবে আইজোরার উপহার।
কী সঠিক ছিল সেই চিন্তা! আজ অবশেষে আমি
পেয়েছি আসল শত্রু, নতুন হাইড্‌ন এক এসে
উত্তীর্ণ করেছে মোরে মহানন্দে চিত্ত-চমৎকার!
এখনই সময়! সযত্নসঞ্চিত প্রেম-উপহার,
মিশে যা, মিশে যা তুই বন্ধুতার পেয়ালায় আজ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সরাইখানার সংরক্ষিত ঘর; একপাশে পিয়ানো।
মোত্‌সার্ট ও সালিএরি টেবিলে বসে]

সালিএরি

এত মনমরা কেন হে, মোত্‌সার্ট?

মোত্‌সার্ট

আমি? কই না তো!

সালিএরি

কী এমন ঘটল যাতে বিচলিত হয়ে আছ তুমি?
ভোজ তো দারুণ হল, মদও জানি সবথেকে সেরা,
তবু কেন চুপচাপ ভুরু কুঁচকে...

মোত্‌সার্ট

স্বীকার করছি —
অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতটাই জ্বালাচ্ছে আমায় বড্ড।

সালিএরি

সে কী!
অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত তুমি লিখছিলে কখন? কবে থেকে?

মোত্‌সার্ট

অনেকদিন — তিন সপ্তা' হবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার...
তোমায় বলি নি কিছু আগে?

সালিএরি

কই, না।

মোত্‌সার্ট

তাহলে শোন।

তিন সপ্তা' আগে এমনি দেরি করে বাড়ি ফিরলে পর
শুনলাম — কে একজন এসেছিল আমার কাছেই
দেখা করতে। কিন্তু কী দরকার তার জানিয়ে যায় নি।
সেদিন সারাটা রাত ভেবেছি: সে কেবা হতে পারে?
কী তার দরকার এত আমার কাছেই? পরদিন
ফের এল লোকটি। আর তখনও ছিলাম না কো বাড়ি।
এরপর তৃতীয় দিন বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে যবে
মেঝেয় জুড়েছি খেলা — বাইরে থেকে ডাকল কে-সে যেন।
বাইরে যেতে দেখি, কালো শোকের পোশাক-পরা লোক
ভদ্র নমস্কার সেরে অনুরোধ জানাল আমায়
অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত একটি লিখে দিতে। লোকটি চলে গেল।
কাজে বসে গেলাম তখ্‌খুনি... কিন্তু তার পরে সেই
কৃষ্ণবেশী কোনোদিন এল না লেখার দাবি নিয়ে...
অবশ্য একদিক থেকে আমি খুশি। লেখাটা অন্যের
হাতে চলে গেলে দুঃখ হোত বৈকি। অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত
অবশ্য বিলকুল তৈরি। কিন্তু তবু আমি...

সালিএরি

তবু তুমি ?

মোত্‌সার্ট

এখন কবুল করতে লজ্জা পাচ্ছি বড়...

সালিএরি

কোন কথা ?

ভিলহেল্ম ক্যুশেলবেকার (১৭৯৭-১৮৪৬)। লাইসিয়ামের দিনগুলো থেকে পুশকিনের সুহৃদ, কবি। ডিসেম্বর অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্যে কারারুদ্ধ থাকেন দশ বছর, পরে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত।

কন্দ্রাতি রিলেয়েভ (১৭৯৫-১৮২৬), কবি। ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের নায়ক হওয়ায় তাঁর ফাঁসি হয়।

১৮২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বরে, সেণ্ট পিটর্স বুর্গের সিনেট স্কোয়ারে ডিসেম্বর অভ্যুত্থান। জলরঙ, ১৮২৫

পুশকিনের পাণ্ডুলিপিতে ডিসেম্বর বিপ্লবীদের ফাঁসির দৃশ্য আঁকা একটি পৃষ্ঠা। তাতে লেখা আছে: 'আমিও হতে পারতাম...' ১৮২৬

মোত্‌সার্ট

দিনে-রাত্রে আমার সে-কৃষ্ণবেশ মূর্তি দিচ্ছে হানা
ঘুমে-জাগরণে। পিছু নিচ্ছে ছায়া হেন দিনে-রাত্রে
যেদিকে, যেখানে যাচ্ছি। এমন কি এই মুহূর্তেই
মনে হচ্ছে সে রয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির মতো এই
টেবিলে মোদের সাথে।

সালিএরি

আরে, ছাড়ো! শিশুর খেয়াল
যতসব! ঝেড়ে ফেল অযৌক্তিক ভয় মন থেকে!
জানো, বন্ধু বোমার্শেই বলতেন: "ভাই রে সালিএরি,
দুশ্চিন্তার কৃষ্ণমূর্তি যখন জ্বালাবে জেনো তার
সোনালি আরোগ্য হল শ্যাম্পেনের বোতল খোলায়,
আর নয়তো 'ফিগারোর বিবাহ-উৎসব' পড়ে ফেলা।"

মোত্‌সার্ট

অবশ্যই! আমি জানি, বোমার্শেই ছিলেন তোমার
প্রিয় বন্ধু; তাঁরই জন্যে রচেছিলে 'তারারা'* তোমার,
ভারি মিষ্টি গীতিনাট্য ওটি। ওতে একটি রাগ আছে...
মনটা খুশি থাকলে যেটি গুন্‌গুন্ নিয়ে গাই আমি প্রায়ই...
লা-লা-লা-লা লা-লা-লা-লা... আচ্ছা, সালিএরি, এ কী সত্যি,
বোমার্শেই কবে যেন কাকে নাকি বিষ খাইয়েছেন?

সালিএরি

মনে তো হয় না: তিনি ছিলেন এমন হাসিখুশি,
অমন নিষ্ঠুর কাজ তাঁর সাধ্য নয়।

মোত্‌সার্ট

বোমার্শেই

ছিলেন প্রতিভাবান, তোমার-আমার মতো। জানি,
শয়তানি, প্রতিভা এক আধারে ধরে না। — ঠিক বলছি?

সালিএরি

তাই বুঝি?

[মোত্‌সার্টের গেলাসে বিষ ঢেলে দিলেন]

কিন্তু পান করছ না-যে।

মোত্‌সার্ট

করি স্বাস্থ্যপান

তোমার, হে বন্ধু! দীর্ঘজীবী হোক সত্য সে-বন্ধন
মোত্‌সার্ট ও সালিএরি যে-বন্ধনে বাঁধা, যুক্ত যাতে
সঙ্গীতের, মূর্ছনার এ-দুটি সন্তান।

[মদ্যপান করলেন]

সালিএরি

রাখো, রাখো!

রাখো!.. এ কী, পান করে ফেললে তুমি? ...আমাকে ছাড়াই?

মোত্‌সার্ট

[হাতমোছার ছোট রুমাল টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে]

যথেষ্ট, আর না।

[পিয়ানোর কাছে গিয়ে]

আচ্ছা, সালিএরি, শোনো তো কেমন
অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতখানা।

[পিয়ানো বাজাতে লাগলেন]

এ কী, কাঁদছ?

সালিএরি

জীবনে কখনও
কাঁদি নি এমন কান্না, একাধারে তিক্ত ও মধুর,
মনে হচ্ছে যেন এক দায়িত্বের ভয়ঙ্কর বোঝা
নেমে গেল ঘাড় থেকে, কিংবা যেন রোগহর ছুরি
নষ্ট প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন করে ফেলল স্নিগ্ধ করুণায়!
মোত্‌সার্ট, দৃক্‌পাত তুমি কোরো না, বাজাও প্রাণ ভরে,
দ্রুত ধাও, অন্তরাত্মা ভরে দাও স্বর্গীয় সঙ্গীতে...

মোত্‌সার্ট

হায় রে, সবাই যদি সঙ্গীতের অমেয় শক্তিকে
এমনি অনুভব করত! কিন্তু না, তাহলে সম্ভবত
বিশ্ব যেত স্তব্ধ হয়ে: কেউ আর ঝক্কি পোহাতে না
জীবনের মোটা ভাত-কাপড়ের চাহিদা মেটাতে;
সবাই তাহলে মুক্তপক্ষ প্রাণ দিত শিল্পে ঢেলে।
আমরা ক'জনা মাত্র: দায়মুক্ত, মুগ্ধ, নির্বাচিত,
যারা পারি উপেক্ষায় তুচ্ছ করতে স্থূল প্রয়োজন,
সেবা করতে একটিমাত্র ঈশ্বরীর — সৌন্দর্যলক্ষ্মীর। —
যথার্থ বলি নি? কিন্তু আজ আমি সুস্থ নই ঠিক।
ভার-ভার লাগছে দেহ; বাড়ি ফিরে ঘুমবো এখন।
বিদায়, তাহলে!

সালিএরি

শুভ হোক!

[একা]

এ-ঘুম তোমার দীর্ঘ,
দীর্ঘস্থায়ী হবে, বন্ধু!.. কিন্তু ও যা বলল তা কি ঠিক —
আমার প্রতিভা নেই? শয়তানি, প্রতিভা
একাধারে ধরে না কো? না-না, মিথ্যে কথা।
তাহলে বুয়োনারত্তি? তাঁর নামে কলঙ্কের দাগা
দিল কি* কবন্ধ জনশ্রুতি? ভাটিকান-নির্মাতা যে,
তাঁকে কি স্পর্শে নি কভু হীন নরহত্যার পাতক?

(১৮৩০)

মর্মর-অতিথি*

Leporello: O statua gentilissima
Del gran' Commendatore!..
... Ah, Padrone!

Don Giovanni**

প্রথম দৃশ্য

[দোন হুয়ান ও লেপোরেল্লো]

দোন হুয়ান

রাতটুকু কাটাব এখানে আজ। আহ্, অবশেষে
মাদ্রিদে পৌঁছনো গেল। এই সে-নগরদ্বার — এবে
পরিচিত যতসব রাস্তা হেঁটে যাব চুপিসারে
পোশাকের আবরণে আবৃতগুম্ফ ও টুপি টেনে
আবৃতললাট। কেউ চিনবে কি আমায়, কী বল হে?

লেপোরেল্লো

অবশ্যই, অবশ্যই! শক্ত হবে দোন হুয়ানকে চেনা!
গন্ডা-গন্ডা হেন লোক রাস্তা হাঁটে কিনা!

** লেপোরেল্লো: মহান সেনাপতির দয়াময় মর্মর-মূর্তি!.. হায় প্রভু! — সম্পাঃ

দোন হুয়ান

কী-যে বল!

কেবা চিনবে মনে কর?

লেপোরেল্লো

কর্তা হে রাতের চৌকিদারে

কিংবা বেদে-ছুঁড়ি, কিংবা রাস্তার মাতাল বাজনদারে,
অথবা আপনার মতো ভদ্রলোক সুযোগসন্ধানী
পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা, হাতে ছোরা — চিনবে অনায়াসে।

দোন হুয়ান

চেনে তো চিনুক! কোনো ক্ষতি নেই। কেবল রাজার
মুখোমুখি না-হলেই হল। কিন্তু হলে — কী-বা করা?
মাদ্রিদে এমন কে-সে আছে যাকে হুয়ান ডরায়!

লেপোরেল্লো

কিন্তু যবে এ-সংবাদ রাজকর্ণে পৌছবে সকালে:
দোন হুয়ান পশেছেন রাজধানী রাজাজ্ঞা ব্যতীত
নির্বাসন থেকে ফিরে — তখন কী হবে কর্তা, শুনি?
কোন শাস্তি দেবেন আপনাকে?

দোন হুয়ান

ফেরাবেন নির্বাসনে,

আবার কী! মুণ্ডচ্ছেদ করে শাস্তি দেবে না নিশ্চয়।
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধে নই তো অপরাধী
কোনোদিন। নির্বাসন দিয়েছেন রাজা স্নেহভরে
যাতে তাঁর আত্মীয়রা, যারা মোর অস্ত্রের শিকার,
তারা কোনোদিন প্রতিহিংসা না-মেটায়...

লেপোরেল্লো

তবে? তবে?

বিদেশে রইলে না কেন স্নেহের মর্যাদা রাখতে?

দোন হুয়ান

সেথা

ক্লান্ত হয়েছিনু বড় নীরস জীবনে। কী-যে দেশ!
কেমন মানুষ, হায় রে! আকাশ?.. ধোঁয়ার আস্তরণ।
আর স্ত্রীলোকেরা? হায়! শোন্ বলি, মূর্খ লেপোরেল্লো,
শুন্‌ছিস গর্দভ? আমি কখনও চাইব না বদলে নিতে
সবথেকে নিরেস যে-চাষীমেয়ে আন্দালুসিয়ার
তারও সাথে ওদেশের সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে — কখনও না!
গোড়ায় ওদের মন্দ লাগে নি কো (স্বীকার করছি),
ওদের নীলাভ চোখ, গাত্রবর্ণ শুভ্র অমলিন,
ললিত বিনীত ভাব, দুরন্তের নতুনত্বে ভরা!
কিন্তু দ্রুত — (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!) — উপলব্ধি হল,
চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল — বিদেশিনী নেহাতই অসার,
প্রাণহীন, মোমের পুতুল যেন — বৃথা অপব্যয়;
কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকেরা!.. আরে, জায়গাটা কেমন
চেনা-চেনা ঠেকছে যেন। চেনো নাকি?

লেপোরেল্লো

অবশ্যই চিনি।

সন্ত আন্তোনির মঠ মনে রাখব, সন্দেহ কী তাতে!
আপনিই আমাকে ওই কুঞ্জবনে ঘোড়া ধরতে বলে
ক্লান্তিকর দায়িত্বের ভার দিয়ে গেছিলেন প্রভু
সময় কাটাতে হেথা মহানন্দে, আর আমি হোথা
রয়ে গেছি অপেক্ষায়।

দোন হুয়ান

[স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে]

হায়, দুঃখী ইনেস্ আমার!

কী ভালোবাসতাম ওকে একদিন! আজ সে কোথায়!

লেপোরেল্লো

ইনেস্! — সে কালো-চোখো মেয়ে! মনে পড়ছে, তিনটি মাস
লেগেছিল ওরে জয় করতে তোমার, মনে হয়
অবশেষে শয়তান-সে হয়েছিল তোমার সহায়।

দোন হুয়ান

তখন জুলাই মাস... রাত্রিবেলা। কী-যে আকর্ষণে
মজেছিনু দেখে ওর ক্লান্ত চোখ, বিবশ দুঠোঁট!
সে বড় অদ্ভুত টান। মনে পড়ছে, লেপোরেল্লো তুমি
পছন্দ করতে না ওকে। সত্যি বলতে, মেয়েটা ছিল না
সুন্দরী বলতে যা বুঝি। কেবল ওর সে-চোখদুটো,
দুটো চোখ আর — সেই অদ্ভুত চাহনি... আর কারও
চোখে আমি দেখি নি কো চাহনি অমন মায়াময়।
কণ্ঠস্বর ছিল শান্ত, ক্ষীণ — যেন-বা অসুস্থ মেয়ে।
স্বামীটাও ছিল ওর আস্ত পশু, দুর্বৃত্ত সাক্ষাৎ,
তবে তা বুঝেছি দেরি করে — হায়, ইনেস্ আমার!..

লেপোরেল্লো

তাতে কী, পরে তো আরও জুটে গেছে।

দোন হুয়ান

তা-ও সত্যি বটে।

লেপোরেল্লো

বেঁচে থাকলে আরও বহু বহুতরো জুটবে ভবিষ্যতে।

দোন হ্বয়ান

তা-ও বটে।

লেপোরেল্লো

তাহলে এবার কার কাছে লাগবে যাওয়া
মাদ্রিদের অন্ধকার সাঁঝবেলায় হেন?

দোন হ্বয়ান

কেন, ল্যরা!
কাছে তার যাব সোজা সোহাগে জানাতে।

লেপোরেল্লো

তা-ই ভালো।

দোন হ্বয়ান

আমি ঢুকব দোর খ্বলে — আর যদি থাকে অন্য কেউ
আমার আসনে সেথা — সে পালাবে জানালার পথে!

লেপোরেল্লো

এই তো মরদের বাত্। এস মাতি খ্বশিতে বিভোর,
বাসি মড়া আমাদের মন জ্বড়ে রবে না এখন।
কিন্তু কে আসছে-না যেন?

মঠবাসী ভিক্ষ্বর প্রবেশ]

ভিক্ষ্ব

রওনা হয়ে গিয়েছেন উনি।
কিন্তু এরা কারা? দোনা আন্নার চাকর হবে ব্বঝি?

লেপোরেল্লো

না, মোরা স্বাধীন জন, নিজেরা নিজের প্রভু, হেথা
বেড়াই স্বেচ্ছায়।

দোন হুয়ান

কিন্তু...কিন্তু আপনি কার অপেক্ষায়?

ভিক্ষু

দোনা আন্না — আছি তাঁরই অপেক্ষায়, তিনিই আসবেন
এখানে স্বামীর এই সমাধির পাশে।

দোন হুয়ান

দোনা আন্না
দ্য সল্‌ভা কি? সে কী! যিনি পত্নী সেনাপতির, সে যাঁকে
হত্যা করেছিল... কে যেন? পড়ছে না মনে ঠিক!

ভিক্ষু

খুনী —
নিরীশ্বর, অবিবেকী দোন হুয়ান নষ্ট চরিত্রের।

লেপোরেল্লো

ওহো! তাই তো! দোন হুয়ান দেখছি নামডাকওলা লোক,
খ্যাতি তার ছড়িয়েছে এমন কি শান্তিধামে, মঠে,
সন্ন্যাসির কুঠুরিও দেখি তার কীর্তনে মুখর।

ভিক্ষু

তোমরা তাকে চেনো নাকি?

লেপোরেল্লো

কাকে? তাকে? মোটেও চিনি না।
আচ্ছা, সে কোথায় আছে এখন?

ভিক্ষু

আছে সে বহুদূরে,
দূরদেশে নির্বাসিত হয়ে।

লেপোরেল্লো

যাক, আপদ চুকেছে।
যত দূরে থাকে ওরা ততই মঙ্গল। আমি হলে
অমন লম্পটদের বস্তা বেঁধে জলে চুবাতাম।

দোন হুয়ান

কী? কী বললি? বল্ দেখি ফের?

লেপোরেল্লো

ও কিছু না, কর্তা। ধাপ্পা...

দোন হুয়ান

তাহলে এইখানে আছে বীর সেনাপতির কবর?

ভিক্ষু

হ্যাঁ গো। তাঁর সাধ্বী পত্নী কবরে দেছেন তুলে মঠ,
আর প্রতিদিন তিনি প্রার্থনা জানান হেথা এসে
স্বর্গত আত্মার শান্তি মেগে, অশ্রুজলে ধুয়ে দেন
সমাধির শিলা।

দোন হুয়ান

আচ্ছা? এ-যে দেখি আজব বিধবা!

অথচ দেখতেও মোটে মন্দ নন?

ভিক্ষু

সৌন্দর্যে নারীর

ভিক্ষুর চঞ্চল হওয়া অনুচিত। মিথ্যা তবু — পাপ;

ঈশ্বরপ্রেরিত সন্ত এমন কি না-মেনে পারে না —

এ-রমণী অপরূপা, অসামান্যা সুন্দরী, মোহিনী।

দোন হুয়ান

মৃত ব্যক্তিটির দেখছি ঈর্ষিত হওয়ার যুক্তি আছে।

শুনেছি আন্নাকে উনি রাখতেন কুলুপ দিয়ে ঘরে।

আমাদের একজনও মহিলাকে দেখে নি কখ্‌খনো।

আজ কিন্তু ওঁর সঙ্গে নিজে আমি কথা বলতে চাই।

ভিক্ষু

আরে না-না। দোনা আন্না নিয়েছেন এক মহাব্রত —

পুরুষের সাথে বাক্যালাপ বন্ধ।

দোন হুয়ান

কিন্তু আপনি, পিতঃ?

ভিক্ষু

আমার ব্যাপার ভিন্ন সম্পূর্ণত; দেখছ তো পোশাক...

ওই উনি এসে পড়েছেন।

দোনা আন্নার প্রবেশ]

দোনা আন্না
পিতঃ, ফটক খুলুন।

ভিক্ষু
খুলছি, সিনিওরা; আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম আপনার।
[ভিক্ষুর পিছু-পিছু দোনা আন্নার প্রস্থান

লেপোরেল্লো
মহিলাকে দেখলেন কেমন?

দোন হুয়ান
কিছুই গেল না দেখা,
বিধবার কালো শোকবস্ত্রে সবই রয়ে গেল চাপা।
কেবল নজরে এল পলকে সুঠাম গুল্‌ফ-দুটি।

লেপোরেল্লো
তাই-ই তো যথেষ্ট। তুমি ভরে তোল নিজ কল্পনায়
চক্ষের নিমেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদ কাঠামো;
কল্পনা তোমার পারে চিত্রীর মতন পূর্ণ করতে
ছবিখানি — কোথা থেকে শুরু করবে, ভুরু না গোড়ালি,
তাতে কিছু এসে-যায় না কো তার।

দোন হুয়ান
শোনো, লেপোরেল্লো,
আলাপ জমাতে চাই ওর সাথে।

লেপোরেল্লো
ওহো, তাই নাকি!
ভালো, ভালো! স্বামীটিকে গোড়ায় পাঠালে যমদ্বারে,
এবার সে-বিধবার অশ্রুতে ব্যাঘাত দেবে বুঝি!
লজ্জা নেই একেবারে!

দোন হুয়ান

আরে দ্যাখো, রাত্রি ঘনিয়েছে!

যতক্ষণে চন্দ্রোদয় আমাদের নাগাল ছোঁবে সে
অন্ধকার মুছে দিয়ে জেবলে দেবে ঝল্মলে গোধূলি,
মাদ্রিদ পেঁছতে হবে আগে তার।

[প্রস্থান

লেপোরেল্লো

সম্ভ্রান্ত অমাত্য

স্পেনদেশী, সে-ও কিনা চোরের মতন রাত্রি খোঁজে,
ভয় পায় চন্দ্রোদয়ে। হায়, এ কী জীবন — হে প্রভু!
অন্তহীন ওর এই খেয়ালি রঙ্গের অভিযানে
কত আর সঙ্গী হব? যত শেষ তত দেখি বেশ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঘর। ল্যরার বাড়িতে নৈশভোজন]

প্রথম অতিথি

ঈশ্বরের দিব্যি, ল্যরা, আগে তুমি কখনও কর নি
আজকের সন্ধের মতো এত অনুপম অভিনয়।
অভিনীত চরিত্রটি বুঝেছিলে আশ্চর্য নিখুঁত।

দ্বিতীয়

কী সুন্দর ব্যাখ্যা! কী-যে অভিনয়-ক্ষমতা দারুণ!

তৃতীয়

একে বলে শিল্প!

ল্যরা

সত্যি, আজ যেন আমার নিকটে
ঘেঁষতে পারে নি কো কোনো অর্থহীন শব্দ, অঙ্গভঙ্গি।
গা ঢেলে দিয়েছি আমি মুক্তমনে কল্পনার স্রোতে।
শব্দগুলো মুক্তি পেল স্মৃতির দাসত্ব মেনে নয়,
মন থেকে — যেন তারা আমার কথাই...

প্রথম

বাস্তবিক।
এমন কি এখনও ওই দুটি চোখ ঝলমলে, উজ্জ্বল,
দুই গালে রক্ত-আভা, অনুপ্রেরণার ঊর্ধ্বশিখা
এখনও তোমার মধ্যে দীপ্যমান। ল্যরা, দিও না কো
নিবে যেতে ওই শিখা উৎসাহবঞ্চিত; গাও, ল্যরা,
শোনাও নতুন গান।

ল্যরা

গীটর এগিয়ে দাও তবে।

[গান গাইতে লাগল]

সকলে

শাবাশ! শাবাশ! আহা মরি-মরি! অপূর্ব! অদ্ভুত!

প্রথম

ধন্যবাদ, জাদুকরি! বুনেছ এ কী-এ মায়াজাল
আমাদের প্রাণমন ঘিরে। এ-জীবনে যত সুখ
তারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানি প্রেমের পরেই সঙ্গীতের
স্থান, আর প্রেমেরও ঊর্ধ্বে সে-কণ্ঠসুধা... দ্যাখো, দ্যাখো,
সবচেয়ে বেরসিক কার্লোস-যে — সে-ও বিচলিত।

দ্বিতীয়

আহা, কী গানের ভাষা! বুকের বীণায় কী ঝঙ্কার
তুলে দিল! কার লেখা — প্রিয় ল্যরা?

ল্যরা

দোন হুয়ান, তার।

দোন কার্লোস

দোন হুয়ান! বলছ কী?

ল্যরা

হ্যাঁ — হেলাফেলায় এই গান
লিখেছে আমার বন্ধু, বেপরোয়া চপল প্রেমিক।

দোন কার্লোস

নাস্তিক লম্পট সে-যে তোমার নারকী দোন হুয়ান,
আর তুমি — তুমি মহামূর্খ!

ল্যরা

তুমি কি পাগল হলে?
স্পেনদেশী অভিজাত যত বড় হও-না কেন তুমি,
চাকরদের ডেকে বলব টুকরো করে ফেলতে তোমাকেই।

দোন কার্লোস

[উঠে দাঁড়িয়ে]

ভালো, তা-ই ডাকো তবে।

জিনাইদা ভলকোন্‌স্কায়া (১৭৯২-১৮৬২)। কবি, সুরকার ও গায়িকা। ১৮২০-এর দশকে পুশকিন প্রায়ই আসতেন মস্কোতে তাঁর নামকরা সালোঁতে।

মস্কো, ত্‌ভেরস্কই ব্‌লভার। লিথোগ্রাফ, ১৮৩০-এর দশক

বলশায়া নিকিৎস্কায়া সরণি, মস্কো, লিথোগ্রাফ, ১৮৩০-এর দশক

ইয়েভগেনি বারাতিন্স্কি (১৮০০-১৮৪৪)। শোককবিতায় প্রসিদ্ধ, পুশকিন ছিলেন তাঁর খুবই গুণমুগ্ধ। লিথোগ্রাফ, ১৮২৮

আলেক্সান্দ্রা মুরাভিয়োভা (১৮০৪-১৮৩২), ডিসেম্বর অভ্যুত্থানী নিকিতা মুরাভিয়োভের পত্নী। সাইবেরিয়ার নির্বাসনে তিনি স্বামীর অনুগমন করেন, তাঁর হাতেই পুশকিন পাঠান ডিসেম্ব্রিস্টদের কাছে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সাইবেরিয়ায়...'।

প্রথম

থাক, যথেষ্ট হয়েছে, ল্যরা,
শান্ত হও কার্লোস তুমিও। ল্যরা ভুলে গিয়েছিল...

ল্যরা

কোন কথা? দোন হুয়ান হত্যা করেছিল একদিন
ন্যায়রণে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভাইকে ওর? সত্যি, দুঃখ এই
ও কেন ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বী সেইদিন।

দোন কার্লোস

চটে উঠে

বোকামি করেছি। সত্যি!

ল্যরা

বটে! স্বীকার পেয়েছ তবে।
তাহলে মিটিয়ে নিচ্ছি বিবাদ!

দোন কার্লোস

দুঃখিত আমি, ল্যরা,
ক্ষমা কর। কিন্তু তুমি জানো, ওই নাম উচ্চারণ
সইতে পারি না কো আমি কোনোদিন...

ল্যরা

কিন্তু কী উপায়
ও-নাম সর্বদা যদি মনে আসে, হে দোন কার্লোস?

জনেক অতিথি

আরে, যেতে দাও। প্রিয় ল্যরা, তুমি আর ক্রুদ্ধ নও
একথা মানো তো? — ধরো গান।

ল্যরা

গা'ব — বিদায় জানাতে।

এখন নেমেছে রাত্রি। কোন গান গাই বল? হ্যাঁ-হ্যাঁ!
মনে পড়ে গেছে — শোন!

[গান গাইল]

সকলে

চমৎকার, সত্যি অপরূপ!

ল্যরা

বিদায় তাহলে, ভদ্রজন!

অতিথিরা

বিদায়, প্রাণের ল্যরা।

[প্রস্থান। কেবল দোন কার্লোসের গমনে বাধা দিল ল্যরা

ল্যরা

ওহে বেদম লড়িয়ে, তুমি সঙ্গ দাও মোরে আজ।
তোমাকে পছন্দ মোর; হাবেভাবে দোন হুয়ান যেন,
শপথ নেয়ার ভঙ্গি ঠিক তেমনি, দাঁতে-দাঁত ঘষা
তেমনি ভয়ঙ্কর।

দোন কার্লোস

ভাগ্যবান ব্যক্তি! ভালোবাসতে বুঝি?
[ল্যরা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে]
সত্যি বল, ভারি ভালোবাসতে তাকে?

ল্যরা

সত্যি, প্রাণভরা।

দোন কার্লোস

এখনও কি ভালোবাস?

ল্যরা

মানে, বলতে চাও এ-মুহূর্তে?
না গো, তা বাসি না। একই সঙ্গে দু'জনাকে ভালোবাসা
অসম্ভব। এখন তোমাকে ভালোবাসি।

দোন কার্লোস

আচ্ছা, ল্যরা,
বলবে তুমি — বয়স তোমার কত?

ল্যরা

আঠারো বছর।

দোন কার্লোস

এত অল্প বয়স তোমার... এখনও তরুণী রবে
বছর পাঁচেক আরও, কিংবা ছয়। পুরুষ নাগর
তোমার দুয়ারে আরও ছ'বছর ভিড় জমাবে-যে,
উপহার দেবে আর আলিঙ্গনে মধুভাষে নেবে
সোহাগ ছিনিয়ে, কানে ঢালবে মধ্যরাতে সেরিনাড,
হয়তো তোমারই জন্যে খুনোখুনি করবে পরস্পরে
রাত্রে চৌমাথার মোড়ে। কিন্তু — যবে সেই সুখদিন
পার হবে, যখন কোটরগত হবে ওই চোখ,
কালি পড়বে কোণে তার, চোখের পাতায় বলিরেখা,
যখন বেণীতে তব প্রথম রুপোলি গুটিকয়
রেখার ঝিলিক দেবে, লোকে বলবে বয়স্কা তোমারে,
কী হবে তখন — বলতে পার?

ল্যরা

তখন? তখন কিবা?

কেন ভাবতে যাব তার কথা? ওকথা তুলছ-বা কেন?
নাকি তুমি সর্বদাই অমনই বিষণ্ণ চিন্তারত?
এস, খোলো জানালাটা। দ্যাখো, আকাশ কেমন শান্ত!
বাতাস কেমন মৃদু মনোরম — রাত সুরভিত
লেবুফুলে, উপসাগরের গন্ধে, চাঁদ কী উজ্জ্বল
অন্ধকারে ক্রমশ ঘনায়মান নীল পট 'পরে—
রাতের পাহারাদার শোনো ওই হাঁকে টেনে-টেনে:
'শান্ত থাকো!'* ... আর দূরে — বহুদূর উত্তরে — প্যারিস,
আকাশ গভীর মেঘে সমাচ্ছন্ন — তা-ও হতে পারে,
হয়তো ফিস্ফিস হিমবৃষ্টি ঝরে, বাতাস উদ্দাম —
কিন্তু তাতে কিবা যায়-আসে? এস, হে দোন কার্লোস,
আমি বলছি হাসো তুমি, হাসো, হাসো — আমার হুকুম।
এ-ই তো লক্ষ্মী, সোনা!

দোন কার্লোস

মোহিনী পিশাচী!

[দরজায় ধাক্কার আওয়াজ]

দোন হুয়ান

কে আছ! ল্যরা কী?

ল্যরা

কে ডাকে, কে? কার কণ্ঠ শোনা গেল ওই?

দোন হুয়ান

দোর খোলো...

ল্যরা

না — এ হতেই পারে না!.. হায় ভগবান!..

দরজা খুলে দিল। দোন হুয়ানের প্রবেশ]

দোন হুয়ান

শুভসন্ধ্যা...

ল্যরা

হুয়ান!..

[ছুটে গিয়ে দোন হুয়ানের কণ্ঠলগ্ন হল]

দোন কার্লোস

এ কী-এ! দোন হুয়ান দেখি!..

দোন হুয়ান

ল্যরা, প্রিয়তমা!

[ল্যরাকে চুম্বন করল]

এখানে তোমার সঙ্গে কে ও, ল্যরা?

দোন কার্লোস

এ দোন কার্লোস!

দোন হুয়ান

তাই নাকি? আরে এ-যে অপ্রত্যাশিত মোলাকাত!
ঠিক আছে, কাল হবে আপনার সঙ্গেই বোঝাপড়া...

দোন কার্লোস

না! এখুনি — এ-মুহূর্তে!

ল্যরা

হে দোন কার্লোস, থাক, থাক!
মনে রেখো, রাজপথে নও তুমি, আমার বাড়িতে —
দয়া করে আমাদের ছেড়ে যাও।

দোন কার্লোস
[ওকে উপেক্ষা করে]

আছি প্রতীক্ষায়।
এসো হে — তোমার সঙ্গে তরোয়াল আছে দেখছি।

দোন হুয়ান
তবে
তাই-ই হোক — যা তোমার ইচ্ছা।

[দু'জনে অসিযুদ্ধ শুরু করল]

ল্যরা
হায়! হায় রে হুয়ান!..

[ল্যরা বিছানায় লুটিয়ে পড়ল — দোন কার্লোসেরও পতন হল]

দোন হুয়ান
উঠে পড়! যুদ্ধ শেষ। ওঠো ল্যরা।

ল্যরা
কী হল? কী হল?
তুমি ওকে হত্যা করলে! চমৎকার! আমার ঘরেই!
এখন কী করি আমি বল দেখি লম্পট শয়তান?
কোথায় পাচার করি দেহ ওর?

দোন হুয়ান
দাঁড়াও, দাঁড়াও —
হয়তো এখনও বেঁচে আছে লোকটা।

ল্যরা
[মৃতদেহ পরীক্ষা করে]

বেঁচে আছে! বটে!
সর্বনাশা, দ্যাখো বিদ্ধ করেছ-যে হৃদ্‌যন্ত্রই সোজা!
নিখুঁত ত্রিকোণ ক্ষত — রক্তহীন — অব্যর্থ সন্ধান!
শ্বাসও বন্ধ হয়েছে — এখন?

দোন হুয়ান
কী করার ছিল বল?
কাণ্ডটা বাধাল ও-ই নিজে থেকে।

ল্যরা
হুয়ান, হুয়ান!
বড় ক্লান্তিকর সেই এক নষ্টামির আবর্তন —
এবং কখনও দোষ তোমার নয় কো... কোথা থেকে
আসা হচ্ছে? ফিরেছ কি বহুদিন?

দোন হুয়ান
এইমাত্র এসে
পেঁৗছেছি। গোপনে তা-ও — রাজক্ষমা ব্যতিরেকে, ঢুকে...

ল্যরা
আর সাথে-সাথে মনে পড়ে গেছে ল্যরাকে তোমার!
স্বীকার করতেই হয়, বলেছ জবর। কিন্তু না-না,
তোমাকে বিশ্বাস নেই! সম্ভবত এই পথে যেতে
আমার বাড়িটা চোখে পড়ে গেছে — তা-ই।

দোন হুয়ান
না-না, ল্যরা,
সাক্ষী লেপোরেল্লো। তাকে শুধোলেই জানবে। আমি আছি
শহরের বাইরে এক জঘন্য চটিতে কোনোক্রমে।
মাদ্রিদে ঢুকেছি শুধু ল্যরার জন্যেই।

[ল্যরাকে চুম্বন করল]

ল্যরা

প্রিয়তম!..

কিন্তু না-না!.. মৃতের সামনেই!.. কোথায় সরাই ওকে?

দোন হুয়ান

ওটা ওখানেই থাক — ভোরের আগেই আমি ওকে
নিজের পোশাকে ঢেকে নিয়ে যাব দূরে, তারপর
ফেলে দেব কোনো চৌমাথায়।

ল্যরা

সেই ভালো। তবে দেখো
পথেঘাটে কোনো লোক চিনে যেন না ফেলে তোমায়।
তুমি-যে পড় নি এসে অল্প-একটু আগে — ভাগ্য মানি!
এখানে আমার সঙ্গে তোমার ক'জন বন্ধু ছিল।
আমরা রাতের খাওয়া সবে সাঙ্গ করেছি, সবাই
চলে গেল এইমাত্র। দেখা হলে কী হোত বল তো?

দোন হুয়ান

আচ্ছা, ল্যরা, ওকে বুঝি ভালোবাসতে বহুদিন থেকে?

ল্যরা

কাকে গো? পাগল হলে নাকি?

দোন হুয়ান

তাহলে স্বীকার কর।

বল, কতবার তুমি প্রতারণা করেছ আমায়
অনুপস্থিতিতে মোর?

লারা

আর তুমি মস্ত সাধু, পাজি?

দোন হুয়ান

বল-না... কিন্তু না থাক, সে মীমাংসা করা যাবে — পরে!

তৃতীয় দৃশ্য

[সেনাপতির মর্মরমূর্তির সমীপে]

দোন হুয়ান

যা ঘটেছে ভালোর জন্যেই: যেহেতু করেছি হত্যা
অবিবেচকের মতো দোন কার্লোসকে, তাই হেথা
দরিদ্র সন্ন্যাসীবেশে আত্মগোপন করেছি, আর
দেখা পাচ্ছি প্রতিদিন সুন্দরী বিধবাটির, মনে
হচ্ছে আমাকেও নজরে পড়েছে তার। এ ক'দিন
পরস্পর রয়ে গেছি ভদ্র দূরত্বের ব্যবধানে;
তবে আজ কথা বলব ওর সাথে: এখনই সময়।
কিন্তু শুরু করি-বা কীভাবে? 'ভয়ে-ভয়ে বলি...', না-না!
'সিনিওরা...' দূরে ছাই! কিবা লাভ মহড়া দিয়ে-বা,
বরং সেকথা বলব যা প্রথম মনে আসবে মোর,
যেভাবে প্রেমের গান রচনায় মাতি — সেইভাবে...
স্ত্রীকে ছেড়ে ঠেকছে বড্ড একা বেচারা সেনাপতির।
ওকে বানিয়েছে দ্যাখো দেবতুল্য ওলিম্পিয়াবাসী!
কিবা বৃষস্কন্ধ! কিবা মহাবীর, হারকিউলিস যেন!
অথচ জীবন্ত লোকটি ছিল হ্রস্বদেহ, অকর্মণ্য...
এত খাটো ছিল লোকটি যদি সে দাঁড়াত ডিঙি মেরে
তাহলেও এ-মূর্তির নাকে হাত পেত না কিছুতে।

পরস্পর মুখোমুখি হয়েছি যেদিন দুইজনে,
মোর তরবারে বিদ্ধ হয়েছে তখন স্থির ও-সে
ঘাসফড়িঙের মতো ক্ষীণদেহ — অথচ ছিল সে
দর্পী ও সাহসী দুই-ই — অদম্য, অনমনীয় লোক...
এই-তো, উনি এসেছেন।

দোনা আন্নার প্রবেশ]

দোনা আন্না

ফের ওঁকে দেখছি হেথা!... পিতঃ,
আবার আপনার ধ্যানে বাধা দিতে হচ্ছে বলে আমি
বিনত মার্জনা চাই।

দোন হুয়ান

ক্ষমাভিক্ষা উচিত আমারই
সিনিওরা তব পাশে। আমিই কি বাধা দিচ্ছি না কো
আপনার পবিত্র শোক প্রকাশের স্বচ্ছন্দ ধরনে?

দোনা আন্না

না পিতঃ, হৃদয়ে মোর শুধুমাত্র শোকের বসতি;
আপনার সম্মুখে মোর দীন এ-প্রার্থনা হয়তো-বা
পৌঁছবে স্বর্গের দ্বারে বিনয়াবনত — দয়া করে
আমার এ-সনির্বন্ধ আবেদনে আপনি যোগ দিন।

দোন হুয়ান

আমি? যোগ দেব প্রার্থনায় তব? দোনা আন্না, হায়!
এত বড় মর্যাদার যোগ্য আমি নই কোনোমতে,
এমন সাহস নেই এই পাপ-ওষ্ঠে প্রতিধ্বনি
তুলি তব প্রার্থনার, পবিত্র শোকের বাণীরূপে।
কেবল দূরের থেকে শ্রদ্ধায় বিনত আমি দেখি —

গভীর নিঃশব্দে তুমি নতজানু হও কৃষ্ণকেশী,
ধীরে নত কর শির বিবর্ণ মর্মর-শিলাপরে
কেশরাশি লুটিয়ে চৌদিকে মুক্তবাধা — মনে হয়
দেবদূতী তুমি ধন্য করেছ এ-দীন সমাধিকে,
এমনও মুহূর্তে তবু বিচলিত হৃদয়ে আমার
উচ্ছ্বসিয়ে ওঠে না প্রার্থনা। শুধু নিঃশব্দ বিস্ময়ে
দূরে থেকে ভাবি — কত সুখী সে-ই যার সমাধির
শীতল মর্মর প্রাণ পায় এ-নারীর উষ্ণশ্বাসে,
ধৌত হয় রমণীর সুকুমার প্রেমের অশ্রুতে...

দোনা আন্না
কেমন — অদ্ভুত যেন কথা ক'টি!

দোন হুয়ান
কিসে সিনিওরা?

দোনা আন্না
আপনি ভুলে গেছেন যে আমি...

দোন হুয়ান
কী? আমি অতীব দীন
অযোগ্য সন্ন্যাসী? আমার এ-পাপকণ্ঠ এত উচ্চে
এখানে ধ্বনিত হওয়া উচিত হয় না — এই কথা?

দোনা আন্না
আমি ভেবেছিনু, আপনি... বুঝে উঠতে পারি নি কো আগে...

দোন হুয়ান
হায়, দেখছি এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন সব, স — ব!

দোনা আন্না

কী বুঝে ফেলেছি, শুনি?

দোন হুয়ান

যে আমি সন্ন্যাসী নই মোটে --

মার্জনা করুন মোরে! পদতলে মার্জনা-ভিখারী...

দোনা আন্না

করেন কী! উঠুন, উঠুন... কে আপনি, বলুন দেখি?

দোন হুয়ান

ব্যর্থ, অন্ধ হৃদয়াবেগের আমি অসুখী শিকার।

দোনা আন্না

এমন কি এখানে এই সমাধিরও পাশে — একী শুনি!
দূর হও এ-মুহূর্তে...

দোন হুয়ান

আরেক মুহূর্ত, দোনা আন্না।

মুহূর্ত সময় চাই!

দোনা আন্না

কী হবে — এখন কেউ এলে?

দোন হুয়ান

সদর ফটকে তালা। মুহূর্ত সময় দিন মোরে!

দোনা আন্না

ঠিক আছে। বল তবে কী তব প্রার্থনা?

দোন হুয়ান

মৃত্যু মোর!

আপনার ও-পদতলে এ-মুহূর্তে যদি মরতে পাই
তাহলে হয়তো এই দীন দেহ সমাধিস্থ হবে
এখানেই — না, তব প্রিয়ের পাশে নয়, হেথা নয়,
এমন কি নয় সমীপেও, এ-সমাধি থেকে দূরে,
কিছুদূরে — সদর ফটক ঘেঁষে, তোরণের নিচে,
যেন তব পদতল স্পর্শ করে সমাধির শিলা,
কিংবা পোশাকের প্রান্ত সে-সমাধি যায় মৃদু ছুঁয়ে,
যখন এখানে তুমি আসবে এই সমাধি-সমীপে,
ভূলুণ্ঠিত কেশদামে, অশ্রুজলে বিগলিত হবে।

দোনা আন্না

বিকৃতমস্তিষ্ক নাকি তুমি?

দোন হুয়ান

মৃত্যুর কামনা — সে কি

মত্ততার একান্ত লক্ষণ? তাই কী সে, দোনা আন্না?
বাঁচার আকাঙ্ক্ষা যদি থাকত মোর তাহলে পাগল
বলতে-বা পারতেন মোরে, কেননা সে-বাঁচাটাই হোত
তব কৃপাদৃষ্টি পাবে কোনোদিন মোর ভীরু প্রেম —
এ-আশার নামান্তর; পাগল হতাম যদি তবে
রাতগুলো কাটাতাম ওই তব বারান্দার নিচে,
অতন্দ্র রাখতাম তোমা' সেরিনাডে সঙ্গীতে জাগর;
ছদ্মবেশ নিতাম না, বরং তোমার দৃষ্টিপথে
নিজেকে আনতাম আমি অনধিকারের বাধা ভেঙে;
পাগল হতাম যদি তাহলে এমন সু-নীরবে
মনোব্যথা সয়ে না-যেতাম...

দোনা আন্না

বলতে চাও, এ-তোমার

নীরব যন্ত্রণা সওয়া?

দোন হুয়ান

দৈবাৎ, ঘটনাচক্রে আজ

নীরবতা ভাঙতে হল আমায় — না হলে কোনোদিন

দুঃসহ রহস্য মোর ও তোমার গোচর হোত না।

দোনা আন্না

প্রেমে কি পড়েছ দীর্ঘকাল?

দোন হুয়ান

দীর্ঘ, নাকি দীর্ঘ নয় —

নিজেই জানি না; আমি শুধু জানি, সেইদিন থেকে

বুঝেছি কতটা মূল্য ধরে এই নশ্বর জীবন,

কিবা সে-মহিমা তার, একমাত্র সেইদিন থেকে

'সুখ' কথাটার কী-যে গূঢ় অর্থ তা-ও জেনে গেছি।

দোনা আন্না

দূর হও এ-মুহূর্তে — বিপজ্জনক লোক তুমি।

দোন হুয়ান

বিপজ্জনক! আমি?

দোনা আন্না

ভয় লাগে তোমার কথায়।

দোন হুয়ান

তবে স্তব্ধ রব; কিন্তু আজ্ঞা কোরো না কো দূরে যেতে —
তোমারে দর্শন মোর এ-জীবনে উৎস আনন্দের।
পোষণ করি না কোনো দুঃসাহসী, উদ্ধত দুরাশা,
কিছুই চাহি না — শুধু বাঁচতে যদি হয়, বয়ে চলি
যদি-বা বাঁচার অভিশাপ, তবে যেন থাক তুমি
নয়নসম্মুখে মোর।

দোনা আন্না

চলে যাও, এ-পবিত্র স্থান
কলুষিত কোরো না কো উন্মাদ প্রলাপ উচ্চারণে।
কাল আগামীতে এস মোর কাছে। কিন্তু দিব্য করো —
সম্মান, মর্যাদা মোর অক্ষুণ্ণ রাখবেই সর্বমতে।
তোমাকে আতিথ্য দেব — কাল দিনশেষে — সন্ধ্যাবেলা —
বিধবা হবার পর আমি কিন্তু কোনো অতিথিকে
গৃহে মোর আহ্বান করি নি...

দোন হুয়ান

হে দেবি, হে দোনা আন্না!
ঈশ্বর সান্ত্বনা দিন তোমায়, যেমন আজ তুমি
সান্ত্বনা বিলালে এই যন্ত্রণা-আহত দীন প্রাণে।

দোনা আন্না

এবার বিদায় নাও তুমি।

দোন হুয়ান

আর-এক মুহূর্ত, শুধু।

দোনা আন্না

বাস্তবিক, আমাকেও ফিরে যেতে হবে এইবার।
তাছাড়া হয়েছে নষ্ট প্রার্থনার অনুকূল মনও।
জাগতিক বাক্যে তুমি মোরে অন্যমনস্ক করেছ।
হেন বাক্য শুনি না কো কতদিন, সে-যে কতদিন।
কাল আগামীতে তুমি আসতে পার...

দোন হুয়ান

এ-যে অবিশ্বাস্য!
এমন সৌভাগ্য মোর! ভরসা পাচ্ছি না, সুখী হব!
কাল দেখা করব অবশ্যই! এবং এখানে নয়,
গোপনে না!

দোনা আন্না

কাল আগামীতে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাল আগামীতে।
কী-যেন তোমার নাম?

দোন হুয়ান

দিয়েগো দ্য কাল্‌ভাদো এ-দীন।

দোনা আন্না

বিদায় জানাই তবে, হে দোন দিয়েগো।

[প্রস্থান

দোন হুয়ান

লেপোরেল্লো!

লেপোরেল্লোর প্রবেশ]

লেপোরেল্লো

কী হুকুম কর্তা, বলে ফেল?

দোন হুয়ান

লেপোরেল্লো! লেপোরেল্লো!

আমি সুখী! বুঝলি, সুখী! কাল — সন্ধ্যা ঢলে পড়লে রাতে...
প্রাণের ইয়ার, তুই তৈরি থাক... কাল আগামীতে...
আমি আনন্দিত শিশুসম!

লেপোরেল্লো

তাহলে পেরেছ বুঝি

কথা বলতে দোনা আন্না সনে? সে বুঝি তোমার দিকে
ছুড়ে দেছে মিষ্টি কথা একটা-দুটো? নাকি হে পবিত্র
পিতঃ, আশীর্বাদে ধন্য তুমি করেছ নারীকে সেই?

দোন হুয়ান

না-না, লেপোরেল্লো, ওসব না! রীতিমতো প্রেমালাপ!
সাক্ষাৎ ও প্রেমালাপ হল!

লেপোরেল্লো

তাই নাকি? বল কী গো...

হায়রে বিধবা, তোরা স — ব এক!

দোন হুয়ান

আমি আনন্দিত!

ইচ্ছে করে বিশ্বটারে দিই আলিঙ্গন গানে-গানে।

লেপোরেল্লো

কিন্তু ও-সেনাপতির বক্তব্য নেই কি এ-ব্যাপারে?

দোন হুয়ান

ভাবছিস ঈর্ষায় লোকটা জ্বলে-পুড়ে যাবে? কখনও না,
কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে লোকটা, তাছাড়া মাটির
নিচে থেকে এতদিনে উষ্ণ রক্ত গেছে হিম হয়ে।

লেপোরেল্লো

মোটেই না, দ্যাখো-না মূর্তির দিকে চেয়ে।

দোন হুয়ান

কী দেখব রে?

লেপোরেল্লো

মনে হচ্ছে ক্রোধে ওর চোখদুটো একাগ্র, তাকিয়ে
তোমার দিকেই...

দোন হুয়ান

তাই কী? তাহলে ভাই লেপোরেল্লো,
যাও — গিয়ে বল ওকে সেনাপতি যেন সঙ্গ দেয়
আমার — আরে না! — যেন আসে দোনা আন্নার প্রাসাদে।

লেপোরেল্লো

মূর্তিকে বাড়িতে ডাকবে? কেন?

দোন হুয়ান

অলস আড্ডায় বৃথা
সময় খরচ করতে অবশ্য নয়-যে তা তো ঠিকই!
এগোও সামনে, মূর্তিকে হুকুম কর — কাল রাত্রে
আন্নার প্রাসাদ-দ্বারে যেন থাকে প্রহরায় ও-সে
সারা সন্ধ্যাবেলা।

লেপোরেল্লো

ভারি অদ্ভুত তোমার রসিকতা।
উনি কে — তা জানো?

দোন হুয়ান
এগোও সামনে!

লেপোরেল্লো
কিন্তু...

দোন হুয়ান
যাও, বলছি!

লেপোরেল্লো
হে মহামহিম, ওগো মহা-সম্মানিত প্রতিমূর্তি!
প্রভু মোর দোন হুয়ান জানাচ্ছেন বিনম্র বচনে
আপনি যেন উপস্থিত... না-না, আর বলতে পারব না কো।
বড় ভয় লাগছে, সত্যি!

দোন হুয়ান
ভীরু! কাপুরুষ! সাবধান!

লেপোরেল্লো
তবে তা-ই হোক! প্রভু দোন হুয়ান বলছেন আপনাকে
উপস্থিত থাকতে কাল রাত্রিকালে আপনার পত্নীর
প্রাসাদ-দুয়ারে...

[প্রস্তরমূর্তি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল]
ও-হো!

দোন হুয়ান
কী হল? হল কী?

লেপোরেল্লো

ও-হো, ও-হো,

ও-হো, ও-হো!.. মলুম, মলুম!

দোন হুয়ান

কী ব্যাপার, বল্ দেখি?

লেপোরেল্লো

[মাথা নেড়ে]

মূর্তি... মূর্তি... ও-হো!..

দোন হুয়ান

মাথা নুইয়ে কী বলিস?

লেপোরেল্লো

না, আমি না,

মূর্তিটা নোয়াল মাথা!

দোন হুয়ান

আবোলতাবোল কী বকিস?

লেপোরেল্লো

নিজে গিয়ে দেখুন-না।

দোন হুয়ান

তা-ই দেখছি, অপদার্থ গেঁয়ো!

[মূর্তির উদ্দেশে]

সেনাপতি, আমন্ত্রণ জানাই আপনাকে — বিধবার
গৃহে তব দ্বাররক্ষী হতে, সেখানে আমিও রব —
কাল রাত্রে আগামীতে। কেমন রাজি তো? আসবেন?

[মূর্তি আবার ঘাড় নাড়ল]

ওহ্ ভগবান!

লেপোরেল্লো

কেমন, বলি নি...

দোন হুয়ান

চল্, যাওয়া যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

[দোনা আন্নার ঘর]

[দোন হুয়ান ও দোনা আন্না]

দোনা আন্না

অভ্যর্থনা জানিয়েছি তোমা', দোন দিয়েগো, তবুও
ভয় হয় — বিষণ্ণ আলাপে মোর ক্লান্ত হবে তুমি।
শোকার্ত বিধবা আমি কিছুতে পারি না ভুলে যেতে
আমার দুর্বহ ক্ষতি। তাই মোর হাসি থাকে মিশে
অশ্রুতে সজল হয়ে যেন-বা এপ্রিল মাস। কই,
তুমি কিছু বলছ না-যে?

দোন হুয়ান

সত্যি, ভাষার অতীত এই
উল্লাস আমার... আমি অবশেষে মিলেছি নিভৃতে
অপরূপা দোনা আন্না সনে, এখানে — ওখানে নয়,

সুখী মৃত মানুষের সমাধিস্থলেরও পাশে নয়,
তোমাকে পেয়েছি হেথা — মর্মর-স্বামীর পাদদেশে
নয় ক্লিষ্ট নতজানু অবস্থায়।

দোনা আন্না
হে দোন দিয়েগো,
তাহলে ঈর্ষিত আপনি? — স্বামী কি আমার তবে ওই
কবরে থেকেও কষ্ট দিচ্ছেন আপনাকে?

দোন হুয়ান
আছে কী সে
অধিকার? জানি, আপনি স্বয়ংবরা।

দোনা আন্না
না। মোর মায়ের
নির্দেশে বরণ আমি করেছিনু দোন আল্‌ভার বীরে,
গরিব ছিলাম মোরা, দোন আল্‌ভার মস্ত বড় ধনী।

দোন হুয়ান
ভাগ্যবান লোক তিনি! শূন্যোগর্ভ ঐশ্বর্যসম্ভার
ঢেলে দিতে পেরেছেন দেবী-পদতলে, বিনিময়ে
পেয়েছেন স্বর্গীয় আনন্দ! হায়, যদি আমি আগে
পেতাম তোমার দেখা — উৎসর্গ করতাম তবে মোর
সকলই, যা-কিছু পদমর্যাদা ও অর্থ, সবকিছু
প্রশ্রয়ের একটিমাত্র মধুময় কৃপাদৃষ্টিতরে!
পবিত্র কর্তব্যজ্ঞানে ভৃত্যরূপে করতাম পূরণ
তোমার সামান্য ইচ্ছা, মেটাতাম খোশখেয়াল যত
আগে জেনে নিয়ে, তুমি নিজ ইচ্ছা বোঝবার আগেই,
অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রজাল হয় যাতে তোমার জীবন...
হায় রে, সৌভাগ্য হেন এ-জীবনে কিছুতে হল না।

দোনা আন্না

দিয়েগো, বোলো না আর: হেন কথা কানে শোনা পাপ,
কেননা তোমাকে হয়তো প্রতিদান দিতেও পারব না।
বিধবার কর্তব্য-যে বিশ্বস্ত মৃতের প্রতি থাকা।
যদি জানতে — স্বামী মোর কত ভালোবাসতেন আমায়!
একথা নিশ্চয় জানি, দোন আল্‌ভার বিপত্নীক হলে
প্রেমমুগ্ধা অন্য কোনো রমণীকে দিতেন না কভু
আপন হৃদয় — তিনি বিবাহ-বন্ধনে সত্যবদ্ধ
থাকতেন নিশ্চিত।

দোন হুয়ান

দিয়ো না হৃদয়ে ব্যথা বারবার
স্বামীর ও-নামোচ্চারে, বিক্ষত কোরো না মোর বুক,
দোনা আন্না। এ-মহৎ শাস্তি হতে দাও অব্যাহতি।
যদিও এ-শাস্তি জানি যোগ্য মোর।

দোনা আন্না

কেন? যোগ্য কেন?
তুমি তো আমার মতো পবিত্র বন্ধনে বাঁধা নও
কারো সাথে — নয় কী তা? তাছাড়া তোমার প্রেম দিয়ে
ক্ষতি কারও করছ না তো — না-আমার, না-স্বর্গের, কারও।

দোন হুয়ান

করি নি তোমার কোনো ক্ষতি! হা ঈশ্বর!

দোনা আন্না

তাহলে কী
ক্ষতি কিছু করেছ আমার? বল, কী-সে ক্ষতি?

দোন হুয়ান

না-না,

কিছু না, কিছু না।

দোনা আন্না

কিন্তু কী ব্যাপার, দিয়েগো বল তো?

আমা' প্রতি কী অন্যায় করেছ? বল-না, কী ব্যাপারে?

দোন হুয়ান

প্রাণ থাকতে নয় কভু।

দোনা আন্না

দিয়েগো, অবাক ঠেকছে ভারি।

মিনতি জানাচ্ছি, বল। হুকুম আমার।

দোন হুয়ান

না-না, না-না।

দোনা আন্না

ওঃ, তা-ই বুঝি! এভাবে তাহলে ইচ্ছা পুরাতে, না?
এইমাত্র কোন কথা বলতেছিলে আমার সমীপে?
ভৃত্যসম সানন্দেই সেবা করতে আমার — তাই না?
সত্যি কিন্তু ক্রুদ্ধ হচ্ছি, দিয়েগো, জবাব দাও দেখি —
কী তোমার অপরাধ মোর কাছে?

দোন হুয়ান

সাহস হয় না,

ঘৃণা কর, চাহি না তা — অথচ শুনলেই করবে ঘৃণা।

দোনা আন্না

কখনও না। এরই মধ্যে ক্ষমা মোর পেয়ে গেছ তুমি।
তবু আমি জানতে চাই...

দোন হুয়ান

ওগো, না, চেয়ো না জানতে সেই
ভয়ঙ্কর, মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক সে-রহস্য।

দোনা আন্না

অত ভয়ঙ্কর রহস্য কী! নাকি তুমি ইচ্ছা করে
কৌতূহলে করে তুলছ উদ্‌ভ্রান্ত আমায় — বল না, কী?
কী করে আমার ক্ষতি করবে তুমি? ছিলে তো অচেনা।
যদি বল শত্রুর কথাই — শত্রু কেউ নেই মোর,
ছিল না কো কোনোদিন। একমাত্র ব্যতিক্রম সে-ই,
হত্যা যে করেছে মোর স্বামীকে।

দোন হুয়ান
[স্বগত]

এবার সে-ই প্রশ্ন!..
আচ্ছা, বল দেখি মোরে: হতভাগ্য দোন হুয়ানকে তুমি
চিনতে কি কখনও?

দোনা আন্না

কই না তো। জীবনে কখনও আমি
লোকটাকে চোখেই দেখি নি।

দোন হ্বয়ান

কিন্তু আজ মনে-মনে
শত্রুতা পোষ কি তার প্রতি?

দোনা আন্না

কর্তব্য হিসেবে তা-ই
বটে, মর্যাদারক্ষায় অবশ্যই। কিন্তু আপনি দেখি
কথা ঘোরাতেই ব্যস্ত। বলুন, দিয়েগো মহাশয় —
কথার জবাব দিন...

দোন হ্বয়ান

আচ্ছা, যদি দোন হ্বয়ানকে আজ
সম্মুখে দ্যাখেন, তবে?

দোনা আন্না

তবে আমি ছুরিকা আমার
বিঁধে দেব শয়তানের বুকে।

দোন হ্বয়ান

দোনা আন্না, ছুরি তবে
নিষ্কাশিত করুন! রেখেছি বুক পেতে।

দোনা আন্না

হে দিয়েগো!
কেন? কেন?

দোন হ্বয়ান

কারণ দিয়েগো নই, আমিই হ্বয়ান।

দোনা আন্না

হায়, এ কী সর্বনাশ! না-না, এ পারে না হতে, আমি
বিশ্বাসই করি না...

দোন হুয়ান

আমি দোন হুয়ান।

দোনা আন্না

না!

দোন হুয়ান

আমি আপনার
স্বামীকে করেছি হত্যা: যা করেছি তার জন্যে মোর
অনুতাপ নেই, নেই এতটুকু বিবেক-দংশনও।

দোনা আন্না

এও কি বিশ্বাস করতে হবে? না-না, এ-যে অসম্ভব।

দোন হুয়ান

আমিই হুয়ান, ভালোবেসেছি তোমায়।

দোনা আন্না

[পড়ে যেতে-যেতে]

হায়-হায়!
এ আমি কোথায়?.. আমি কোথায়? হারিয়ে ফেলছি জ্ঞান...

দোন হুয়ান

এ কী? কী হল আপনার, দোনা আন্না? হায় ভগবান!
উঠুন, উঠুন, চোখ মেলুন, দেখুন দিয়েগোকে,
ভৃত্য পদপ্রান্তে উপস্থিত।

দোনা আন্না

যান, আপনি চলে যান।

[ক্ষীণস্বরে]

আহ্, তুমি শত্রু মোর, লুণ্ঠন করেছ তুমি সব
যা ছিল আমার এ-জীবনে...

দোন হুয়ান

ওগো, মোর প্রিয়তমা!

এ-আঘাত মুছে দেব আমার যা-কিছু সব দিয়ে।
দ্যাখো, পদপ্রান্তে আমি অপেক্ষায় তব আজ্ঞাধীন।
তোমার হুকুমে মরব, বেঁচে থাকব তোমারই আজ্ঞায়
তোমার জন্যেই শুধু...

দোনা আন্না

ওহ্! এই তবে দোন হুয়ান...

দোন হুয়ান

হ্যাঁ, সে-ই। শুনেছ তুমি যার হেন চরিত্র-বর্ণন —
অমানুষ, পাষণ্ড-যে — দোনা আন্না! (ঠিক বলছি নাকি?)
হতে পারে এই উচ্চ প্রশংসায় কিছু সত্য আছে,
ক্লান্ত বিবেকের স্কন্ধে হয়তো মোর চেপে আছে বহু
বহুতরো অন্যায়ের গুরুভার। যথা, সত্য এটা —
দীর্ঘদিন নীতিভ্রষ্ট লাম্পট্যের বশ্যতা মেনেছি,
তবুও তোমাকে আমি প্রথম দেখলাম যবে — তার
পর থেকে পুনর্জন্ম পেয়েছি যেন-বা নবরূপে।
ভালোবেসে তোমাকেই প্রেমে পড়ে গেছি সতীত্বের।
জীবনে প্রথম এই প্রকম্পিত নতজানু আমি
নীতিনিষ্ঠতার পদতলে দীন জানাই বিনতি।

দোনা আন্না

দোন হুয়ান সিদ্ধবাক — একথা ভালোই মোর জানা।
শুনেছি, রমণী-মনোহরণেও অতি দক্ষ সে-যে।
লোকে বলে তুমি নাকি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক লম্পট।
পিশাচের তুল্য তুমি। বল দেখি, কত রমণীর
মন নিয়ে সর্বনাশ সেধেছ?

দোন হুয়ান

কখনও কারে আমি
ভালোবাসি নি কো — আজ ছাড়া।

দোনা আন্না

তাহলে কি মানতে হবে
এবারই প্রথম প্রেমে পড়েছেন দোন হুয়ান, আর
আমি নই নতুন শিকার, বেশি কিছু তার চেয়ে?

দোন হুয়ান

যদি-বা চাইতাম আমি প্রতারিত করতেই তোমারে,
আত্মপরিচয় তবে দিতাম কি? কর্ণে বিষক্ষর
এই নাম উচ্চারণ করতাম কখনও? আচরণে
হিসাবি কৌশল কিংবা ধূর্তামি-সে দেখেছ কি মোর?

দোনা আন্না

মতিগতি তব বোঝা ভার... কিন্তু এখানে কেন-যে
এলে তুমি: যেথা চিনে ফেলতে পারে পরিচিত জন,
যেখানে নিস্তার নেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে?

দোন হুয়ান

মৃত্যুতে কী ভয়? যদি সুধাস্যন্দী প্রেমের প্রহর
উদ্‌যাপনে পাই — প্রাণ দিতে পারি নিঃশব্দে, সু-হেসে।

দোনা আন্না
কিন্তু পালাবে কী করে শহর ছাড়িয়ে, বেপরোয়া?

দোন হুয়ান

[দোনা আন্নার হাতে চুম্বন করে]
হুয়ানের প্রাণ নিয়ে এত চিন্তা তোমার, প্রেয়সী!
দোনা আন্না, অর্থ কিবা এর? সে কি এই — মোর প্রতি
ঘৃণায় বিতৃষ্ণ নয় স্নিগ্ধ তব দেবোপম মন?

দোনা আন্না
হায় রে, উচিতমতো যদি-বা পারতাম ঘৃণা করতে!
কিন্তু, থাক — সময় হয়েছে এবে বিদায় নেবার।

দোন হুয়ান
ফের কবে দেখা হবে?

দোনা আন্না
জানি না। হবে-বা কোনোদিন
সুনিশ্চিত।

দোন হুয়ান
সে কী কাল?

দোনা আন্না
কোথায় তাহলে?

দোন হুয়ান
এখানেই।

দোনা আন্না

হায়, দোন হ্‌য়ান, কী-যে দুর্বল, বিবশ মোর মন।

দোন হ্‌য়ান

ক্ষমার প্রমাণ কিন্তু একটিবার প্রসন্ন চুম্বনে।

দোনা আন্না

থাক-না, এবার যাও।

দোন হ্‌য়ান

দাও একটি শীতল, প্রসন্ন...

দোনা আন্না

কিছুতে মেটে না আশ! আচ্ছা এস... হল তো? বিদায়!
কিন্তু ও-কে ধাক্কা দিল দোরে?.. দোন হ্‌য়ান, লুকোও-না!

দোন হ্‌য়ান

বিদায়, আবার দেখা হবে এরপর, প্রিয়তমা।

[ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ফের দৌড়ে ফিরে এল]

ওহ্‌!..

দোনা আন্না

কী হল? হল কী?

[সেনাপতির মর্মর-মূর্তি ঘরে ঢুকল; দোনা আন্না মূর্ছা গেল]

মর্মর-মূর্তি

ডেকেছিলে, এসেছি-যে তাই।

দোন হুয়ান

হায় ভগবান! হায় দোনা আন্না!

মর্মর-মূর্তি

ও-নাম নিও না।

ঘনালো অন্তিম কাল, দোন হুয়ান! কাঁপছ দেখি ভয়ে?

দোন হুয়ান

আমি? না তো। আমন্ত্রিত, স্বাগত জানাই তোমা' এবে।

মর্মর-মূর্তি

কই, দাও দেখি হাত।

দোন হুয়ান

এই নাও... উহু, কী কঠিন

প্রস্তর-মুষ্টির আলিঙ্গন! ছাড়ো, যথেষ্ট হয়েছে,
ছেড়ে দাও বলছি, ছাড়ো, হাত ছাড়ো, যেতে দাও মোরে...
এ কী মৃত্যু -- এ কী-এ অন্তিম কাল — দোনা আন্না, ওগো!

[মাটির মধ্যে দু'জনে সেঁধিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।]

(১৮৩০)

মৎস্যকন্যা*

নীপার নদীর তীর। গমপেষাই হাওয়াকল

[কলমালিক ও তার মেয়ে]

কলমালিক

আহ্, তোরা সব সমান, তোরা কচি ছুঁড়ির দল,
সবাই বড্ড বোকা। যখন পাস কপালের জোরে
ঈর্ষা জাগায় এমন মস্ত গন্যিমান্যি লোক,
তখন তোদের কাজ হল তায় আষ্টেপৃষ্ঠে পাকড়ানো।
কীভাবে? না, ঠান্ডা মাথায় সংযত মেজাজে,
এই কড়া, এই বিগলিত, নরম-গরম ফুঁয়ে
জীইয়ে রেখে মোহের আগুন। কভু — কথাচ্ছলে
বিয়ের কথাও পাড়া; তবে সবথেকে দরকারি
কৌমার অক্ষত রাখা — সে অমূল্য ধনে,
মুখের কথার মতো সে-যে একবার হাতছাড়া
হলে আর তো ফেরে না কো। আর যদি না-থাকে
বিয়েরই বন্ধনে বেঁধে ফেলার আশা কিছু,
তাহলে কম করে উচিত আদায় করে নেয়া
নিজের পরিবারের জন্যে সুখসুবিধে খানিক,

ভাবা উচিত: 'বাসবে না কো ভালো আমায় সে তো
চিরটা কাল, চাবে না মুখ আমার।' — কিন্তু কই,
সুযোগ এমন কাজে লাগাস সে-হুঁশ দেখি না তো!
এখনও তুই রইলি মজে মোহের ঘোরে, চলিস
মুখের কথা না-খসাতে ইচ্ছেপূরণ করে,
মহানন্দে ডগমগ কণ্ঠলগ্ন হয়ে
থাকিস সারাদিন নাগরের, খেয়াল আছে সে কি
আজ যে নাগর কাল সে রবে না কো, হবে উধাও —
তুই থাকবি শূন্য হাতে; হায় রে বোকা ছুঁড়ি!
বলি নি কি তোরে পইপই করে শতেক বার:
ওরে মেয়ে, র' হুঁশিয়ার, যাস নি বোকা বনে,
এমন সুযোগ হাতে পেয়ে হেলায় হারাস নি কো,
দিস না যেতে রাজপুত্রে মুঠির নাগাল ছেড়ে,
সেধে ডেকে নিস না নিজের সর্বনাশটা। — এখন?..
এখন শুধু কান্নাই সার গোটা জীবন বসে,
কান্না তবু ফেরাবে না তারে।

মেয়ে

কিন্তু কেন
ভাবছ যে সে ছেড়েই গেছে মোরে চিরতরে?

কলমালিক

ভাবছি কেন? আচ্ছা, বল্ তো, প্রতি হপ্তায় ক'বার
এসে উদয় হোত ছোঁড়া মোদের হাওয়াকলে?
বল্-না ক'বার? প্রত্যেক দিন, মাঝেমধ্যে দু'বার
আসত দিনে, পরে একটু ঢিলে দিল, তারও
পরে আরও কমল আসা — আর আজ গোটা ন'দিন
আসে নি সে, দেখায় নি মুখ। তবে? বলবি কিছু?

মেয়ে

ব্যস্ত মানুষ: কাজকর্ম নেই নাকি ওঁর ভাবো?
হাওয়াকলের মালিক তো নন — খাটবে-যে ওঁর হয়ে
জলের ধারা দেদার। ওঁকে বলতে শুনেছি তো —
এ-দুনিয়ায় সবার থেকে কঠিন কাজটি ওঁরই।

কলমালিক

আজব কথা! রাজপুত্তুর কাজ করে সে কবে?
কাজ কী ওদের, শুনি? — শেয়াল, শশক শিকার করা,
ভোজ দেয়া, হৈ-হল্লা করা, পড়শি শাসানো,
তোর মতো সব হাবাগবা ছুঁড়িরে ফুস্‌লানো।
ওরেও নাকি কাজ করতে লাগে! কোথায় যাব!
আবার নাকি কাজ করে জল আমার!.. আমি বলে
স্বস্তি পাই নে দিনে-রাতে, সদাই সজাগ থাকি!
হেথায়-হোথায় লেগেই আছে নতুন মেরামতি,
ভাঙাপচা, ফুটোফাটা দিচ্ছি জোড়া। তবু
যদি-বা তুই রাজার ছেলের কাছে নিতিস মেগে
পয়সা কিছু, কলটা হোত স-যুত, হোত কাজ।

মেয়ে

ওই-যে!

কলমালিক

অ্যাঁ? ওই কী রে?

মেয়ে

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনি!

ওই তো ঘোড়া... উনি এলেন!

কলমালিক

খেয়াল রাখিস, মেয়ে,
যা বলেছি মনে রাখবি, ভুলিস নে কিছুতে।

মেয়ে

এই-যে উনি এলেন।

[রাজপুত্রের প্রবেশ। ঘোড়া নিয়ে সহিসের প্রস্থান]

রাজপুত্র

শুভদিন গো, প্রিয়তমা।
শুভদিন হে কলের মালিক!

কলমালিক

হে রাজকুমার, প্রভু,
সুস্বাগত। কত-যে দিন রয়েছি বঞ্চিত
ওই আপনার বিজলি-হানা কৃপাদৃষ্টি হতে।
আজ্ঞা করুন, জলযোগের যোগাড় করি গিয়ে।

[প্রস্থান

মেয়ে

এতদিনে আমায় বুঝি পড়ল মনে তোমার!
লজ্জা হল না কো এমন দীর্ঘদিন মোরে
কষ্ট দিতে, রাখতে ফেলে একা — প্রতীক্ষায়?
যদি জানতে কী দুশ্চিন্তা বয়েছি এ-মনে!
অমঙ্গলের ভয়ে কত ব্যাকুল হয়েছি-যে!
চিন্তা হোত, ঘোড়া নিয়ে খাড়াই পাহাড় থেকে
উলটে বুঝি পড়লে গভীর জলায়, চোরা পাঁকে,
ফের ভেবেছি, ভল্লুকেরই শিকার হলে বনে,

হয়তো তুমি অসুস্থ-বা, নয়তো ভালোবাসা
উবেই গেছে — তবু যা হোক, সুস্থ — আছ বেঁচে,
আগের মতো আমায় তুমি সমান ভালোবাস,
তাই-না রাজপুত্র, তা-ই?

রাজপুত্র

আগের মতোই, সোনা।
না-না, আগের চেয়েও বেশি —

মেয়ে

কিন্তু তুমি কেন
বিষণ্ণ গো? কী হয়েছে?

রাজপুত্র

বিষণ্ণ? কই, না তো?
ও কিছু না, ভ্রান্তি তোমার। আমি আনন্দিত —
তোমার দেখা পেলে যেমন সর্বদা হই।

মেয়ে

না গো,
খুশি হলে ছুটে তুমি আসতে আমার কাছে,
দূরের থেকে বলতে হেঁকে: 'কোথায় তুমি প্রিয়া,
কোন কাজে গো ব্যস্ত এখন?' চুমু দিয়ে পরে
জানতে চাইতে: খুশি আমি তোমায় দেখে? নাকি?
ভেবেছি কি আসবে তুমি এতেক তাড়াতাড়ি?
আজকে কিন্তু শুনছ কথা, বলছ না কো কিছু,
দিচ্ছ না কো আলিঙ্গন আর চুমু চোখের পাতায়:
কাজেই আছে কিছু-একটা দুশ্চিন্তাই। — কী সে?
না কি, তুমি আমার 'পরে রাগ করেছে, প্রিয়?

রাজপুত্র

সত্যি কথা, ভান করাটা উচিত হবে না কো।
ধরতে তুমি পেরেছ ঠিক! বুকে আমার বোঝা
চেপে আছে দুঃখের ভার — কিছুতে পারবে না
সোহাগ দিয়ে আলিঙ্গনে সে-দুঃখ ভোলাতে,
পারবে না কো শান্তি দিতে, দুঃখেরও ভাগ নিতে —

মেয়ে

কিন্তু বড় লাগছে নিতে না-পেরে সেই তোমার
দুঃখের ভাগ — কী-সে দুঃখ বল না গো প্রিয়।
যদি চাও তো ফেলব চোখের জল, যদি না-চাও —
তবে আমার কান্না তোমায় বিরক্ত করবে না।

রাজপুত্র

মিথ্যে কেন কথা বাড়াই? বলে ফেলাই ভালো।
প্রিয়তমা, বুঝলে, এ-সংসারে চিরস্থায়ী
সুখ বলতে নেই কো কিছু — না-পদমর্যাদা,
না-রূপ, না-দৈহিক বল, না-ঐশ্বর্য — কিছুই
না পারে ঠেকাতে অন্ধ নিয়তির বিধান।
এবং আমরা — (সত্যি নয় কি, মিষ্টি ছোট্ট মেয়ে?) —
আমরা ছিলাম মহাসুখে; অন্তত, এই আমি
মগ্ন ছিলাম তোমায় নিয়ে, তোমায় ভালোবেসে।
কিন্তু যদি ভাগ্য আমায় অন্যরকম গড়ে,
যেথায় থাকি না কো আমি মনে রাখব তোমায়,
প্রিয়তমা; হারাই যদি তোমায় তবে ক্ষতির
পূরণ হবে না কো আমার গোটা জীবন ধরে।

মেয়ে

বলতে কী-যে চাইছ তুমি বুঝতে পারি না কো,
তবু বিষম ভয়ে কাঁপছি। না জানি কপালে
আছে কিবা, কী দুর্বিপাক ভাগ্যে আছে লেখা।
হয়তো হবে ছাড়াছাড়িই।

রাজপুত্র

ধরলে তুমি ঠিকই।
হবে মোদের ছাড়াছাড়ি — এই কপালের লিখন।

মেয়ে

কিন্তু মোদের পৃথক করবে কে সে? পারি নাকি
যেতে তোমার পিছু-পিছু যেথায় যাবে তুমি?
বালকবেশে সঙ্গী হব, রব তোমার দাসী
প্রবাস-পথে, কিংবা রণক্ষেত্রে — আমার ভয়
নেই কিছুতে, যুদ্ধেও না — যদি থাকতে পাই
কাছে তোমার, রাখতে পারি চোখে-চোখে।... না-না,
মিথ্যে কথা! পরীক্ষাতে ফেলতে চাইছ মোরে,
নয়তো মিথ্যে দেখাচ্ছ ভয় হালকা হাসির ছলে।

রাজপুত্র

না-না, আজকে নেই কো আমার রসিকতার মেজাজ,
পরীক্ষাতে ফেলব তোমায় নেই তার দরকারও;
যোদ্ধবেশে রণক্ষেত্রে যাচ্ছি না কো আজ,
যাচ্ছি না কো সুদূর দেশেও। রইব আমি ঘরেই,
তবু তোমায় চিরতরেই থাকতে হবে ছেড়ে।

মেয়ে

দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখন আমি বুঝেছি সবকিছু...
বিয়ে করছ তুমি, তাই-না?

[রাজপুত্র চুপ]

বিয়ে করছ তুমি!

রাজপুত্র

কী করা যায়? বিচার কর নিজেই: রাজার ছেলে
স্বাধীন তো নয় কাঁচ মেয়ের মতো — হৃদয় মেনে
জীবনসঙ্গী নেয় না বেছে, পরের হিসাবমতো
চলতে-যে হয় তাকে, সবার ভালোর কথা ভেবে।
সান্ত্বনা দিক তোমায় ভগবান ও সময় সুধীর।
ভুলো না কো আমায়; ধর স্মরণচিহ্ন এই
রত্ন-শিরোবন্ধ — দাও-না, পরিয়ে দিই আমি।
আর এনেছি সঙ্গে করে এই কণ্ঠহার —
এটাও ধর। এনেছি আর পিতার জন্যে তোমার,
কথা দিয়েছিলাম বলে — দিও এইটে তাঁকে।

[সোনার মোহর ভর্তি একটা থলি মেয়েটির হাতে গুঁজে দেয়]

বিদায় তবে —

মেয়ে

একটু দাঁড়াও। কী একটা-যে বলার
ছিল তোমায়... ভুলে যাচ্ছি...

রাজপুত্র

ভাবো।

মেয়ে

তোমার তরে
করতে পারি সকল-কিছু... না, তা তো নয়... দাঁড়াও —
কিছুতে না, পারো না কো ছেড়ে যেতে আমায়

চিরতরে... না, তা-ও না, এসব কিছুই নয়...
হ্যাঁ! পড়েছে মনে এবার: আজকে তোমার ছেলে
আমার বুকের নিচে প্রথম উঠল নড়ে-চড়ে।

রাজপুত্র

হায় অভাগী! কী-যে করার আছে? — নিজের প্রতি
নজর দিও ওটার কথা ভেবেই; পরিত্যাগ
করব না কো আমি তোমায়, তোমার সন্তানেরে।
সময়-সুযোগ হলে হয়তো নিজে আসব আমি
দেখা করতে যে-কোনোদিন। কেঁদ না, থির হও।
এস, তোমায় নিই বুকে এই শেষবারেরই মতো।

চলে যেতে-যেতে]

বাঁচা গেল!.. মস্ত বোঝা নামল-যে বুক থেকে।
ভেবেছিলাম উঠবে-বা ঝড়, কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার
মিটে গেল দিব্যি সহজভাবেই।

[প্রস্থান। মেয়েটি নিথর, নীরব

কলমালিক

[ঢুকতে ঢুকতে]

দয়া করে

আসতে আজ্ঞা হোক এ-দীনের ঘরে... কোথায় তিনি?
বল্-না, কোথায় রাজপুত্তুর? বাহ্-বা, চমৎকার
শিরোবন্ধ দেখি! মণিমাণিক্যে ঝলমলায়,
জ্বলছে যেন আগুন-পারা! মুক্তোখচা!.. এ তো
রাজ-উপহার হবেই। আহা, ধন্য রাজকুমার!
হাতে ও কী? থলি নাকি! টাকা নেই কো ওতে?
কিন্তু সাড়া না-দিয়ে তুই থমকে আছিস কেন?

বলছিস না কেন কিছু? এমন আশাতীত
পড়ে-পাওয়া ধন পেয়ে কি হলি রে বিহ্বল?
নাকি হলি স্তম্ভিত রে, বেবাক হতবাক?

মেয়ে

না, কিছুতে সম্ভব না, হতেই পারে না এ।
এতেক ভালোবাসো আমার... ও কি বনের পশু?
হৃদয় কি ওর বশ মানে না?

কলমালিক

কার কথা কস, মেয়ে?

মেয়ে

আচ্ছা, বাবা, এমন কি-সে দোষ করলাম যে সে
চটে গেল আমার 'পরে? সাতটি দিনেই শুধু
রূপ গেল মোর উবে? নাকি তুক করেছে কেউ
ওষুধ দিয়ে ওকে?

কলমালিক

অমন করিস কেন তুই?

মেয়ে

বাবা গো, সে গেছে চলে। ওই ছুটেছে ঘোড়া!
আমার এমন মাথা খারাপ, দিলাম ওকে যেতে!
বসন চেপে ধরি নি কো, ধরি নি লাফ দিয়ে
ঘোড়ার লাগাম চেপে, শূন্যে ঝুলি নি তাই ধরে!
হায়, যদি ও ক্রোধের বশে মণিবন্ধ থেকে
হাতদুটো মোর দিত কেটে, ঘোড়াটা ওর যদি
খুরের নিচে পিষে আমায় ফেলত মেরে, হায়!

কলমালিক

পাগল হলি, মেয়ে?

মেয়ে

পাগল বটে! রাজার ছেলে
স্বাধীন তো নয় কচি মেয়ের মতো — হৃদয় মেনে
জীবনসঙ্গী নেয় না বেছে... কিন্তু স্বাধীন সে-যে
সম্ভবত লোভ দেখানোয়, দিব্যি দিতে, কে'দে
বলতে, 'আমি যাবই নিয়ে তোমায় প্রাসাদে মোর,
রাখব আলোঝলা গোপন কোণে একটি ঘরে,
মুড়ে দেব জরিতে আর মখমলে পোশাকে।'
ওর বাধা নেই অসহায়া মেয়েকে পাঠ দিতে
মাঝরাত্রে ঘর ছেড়ে পথ ছুটতে বাঁশির ডাকে,
ভোর অবধি থাকতে বসে হাওয়াকলের পিছে।
রাজার হৃদয় আনন্দ পায় দুঃখকষ্টে মোদের
মিষ্টি দরদ জানাতে — আর তারপরে বিদায়:
প্রিয়তমা, নাও গো এবার নিজেরই পথ বেছে,
ভালোবাসো যাকে খুশি।

কলমালিক

ব্যাপার তবে এই!

মেয়ে

কিন্তু কে তার বধূ হবে? মোর বদলে কারে
বরণ করল ও-সে? আমায় জানতে হবে আজ,
পাবই খুঁজে হৃদয়হীনা কে-সে, বলব তারে:
ছেড়ে দে তুই রাজপুত্রে, দুই বাঘিনী কভু
জানিস তো এক বনে শিকার করে না কো।

কলমালিক

বোকা!

রাজপুত্তুর চায় যদি-বা বিয়ে করতে, তবে
কে ঠেকাতে পারে তারে? ঠিক হয়েছে! তোরে
বলি নি কি হাজারো বার...

মেয়ে

সে তো পারত নিতে

আমার কাছে বিদায় ভদ্র হৃদয়বানের মতো,
দিতে পারত উপহারও -- নয় কি? কিবা ভাবো?
কিন্তু দিল টাকা! চাইল, মুক্তিপণ দিতে!
ভেবেছে সে সোনারুপোয় বন্ধ করবে মুখ,
যাতে কোনো গুজব ও-তার মন্দ স্বভাবের
না-পৌঁছয় তরুণী-সে রাজকন্যের কানে।
ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম-যে প্রায় — তোমায়
দিয়ে গেছে সে এই টাকার থলি, তোমার যতো
দয়ার কথা স্মরণ করে, সেই-যে মেয়েটাকে
লাগামছাড়া করেছিলে ঘুরতে ওরই পিছু,
ব্যস্ত হও নি ধর্মরক্ষা করতে তারই — তাই...
তোমারই লাভ আমার সর্বনাশে।

[বাপের হাতে টাকার থলি দেয়]

কলমালিক

[কাঁদতে কাঁদতে]

হায় রে হায়,

এমন কথা শুনব বলে বেঁচে ছিলাম! ধিক,
ধিক রে তোরে, বুড়ো বাপে এমন কঠিন কথা
শোনালি তুই! তুই-যে আমার একটিই সন্তান,
শেষবয়সে আমার-যে তুই একান্ত সান্ত্বনা।

লাই না-দিয়ে তোরে আমার উপায় ছিল কিবা?
বাপের যোগ্য কাজ না-করায় তাই কি ভগবান
শাস্তি দিলেন আমারে আজ!

মেয়ে

আটকে এল শ্বাস!
ঠাণ্ডা একটা সাপ গলাটা জড়ায় পাকে-পাকে!..
সাপ, ওরে সাপ! গলায় সে-যে জড়াল কালসাপ,
মুক্তোমালা নয় তো!..
[গলা থেকে মুক্তোর মালা টেনে ছিঁড়ে ফেলে]

কলমালিক

আরে, করিস কী রে তুই!

মেয়ে

এ-ই ভালো! দিই টুকরো করে তোরে সর্বনেশে,
চোর ওরে, তুই করলি হরণ ভালোবাসার ধনে!

কলমালিক

পাগল হলি নাকি রে তুই!

মেয়ে

[মাথা থেকে শিরোবন্ধনী খুলে নিয়ে]

এই-সে আমার মুকুট,
অপমানের মুকুট, ছি-ছি! বিয়ের শিরোভূষণ
শয়তান-সে দিল আমার মাথায় আমি যখন
মুখ ফিরিয়ে নিলাম পরম চাওয়া-পাওয়ার থেকে।
আজ আমাদের বিয়ের ইতি — যা চলে মোর মুকুট!
[শিরোবন্ধনী নীপারের জলে ছুড়ে দিল]

এবার আমার সব ফুরুল...

[নিজে নদীতে ঝাঁপ দিল]

বৃদ্ধ

[মাটিতে আছড়ে পড়ে]

কী সর্বনাশ! ও-হো!

রাজপুত্রের প্রাসাদ

[বিয়ের উৎসব। টেবিলের ধারে বরকনে আসীন। ঘটক-ঘটকী ও অতিথিরা। সমবেত সঙ্গীতগায়িকা তরুণীর দল]

ঘটক

দিলাম আমরা সুখের বিয়ে, এ-বিয়ে রাজযোটক।
যুবরাজ গো, রাজকন্যে — স্বাস্থ্যপান করি!
ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবন থাকো সুখে,
থাক আমাদের জন্যে — নেমন্তন্ন ঘনঘন।
সুন্দরী কন্যেরা, তোমরা চুপটি করে কেন?
শুভ্রবরণ হংসীরা চুপ উড়াল ভুলে কেন?
নাকি, মিষ্টি গানের পুঁজি এরিমধ্যে শেষ?
নাকি, অধিক গান গেয়ে সব ধরল গলা বুঝি?

সমবেত কণ্ঠে গান

ঘটকমশাই, ঘটকমশাই,
ঘটক-বুড়া বোকার গোঁসাই!
কনে খুঁজতে বেরিয়ে সে —
ছাঁচতলাতে থামল শেষে,

বীয়ার-পিপে উপুড় করে
ঢালল বাঁধাকপির 'পরে,
জঞ্জালেতে আছাড় খেয়ে
দোরের আড়ায় কয় বিনয়ে:
'ও খোঁটা ভাই, দোরের আড়া,
দেখাও কোথায় দেব পাড়া —
চাই-যে যেতে কনের পাড়া।'
ঘটকমশাই, বল দেখি
টাকার থলি কোথায়? সে কী
নাচায় টাকা খেলার ছলে
সুন্দরীদের দেবে বলে?

ঘটক

শয়তানী-সব! আ মর্, কী-যে গানের ছিরি তোদের!
হাত পেতে নে, ঘটক-বুড়োয় দে দিকিনি রেহাই!
[মেয়েদের টাকা দেয়]

একক কণ্ঠে গান

যেথায় পাথরনুড়ির শয্যা, হলুদ বালি সরে,
সেথায় দ্রুত যায় বহিয়ে পাগলাঝোরা নদী;
সেই জলেতে সাঁতার দিত ছোট্ট দুটি মাছ,
মাছদুটি-সে ছোট্ট, দুটি জলকেলির সাথী।
তারপরে সে কী হল তা জানিস, মাছের বোন?
আমাদের এই নদীর জলে কী ঘটল তা শোন!
কেমন করে কাল সন্ধেয় ফুটফুটে এক মেয়ে
প্রেমিককে তার শাপ দিয়ে সে ডুবে মরল জলে!

ঘটক

সুন্দরী-সব! এমন দিনে এ কী গানের ছিরি?
এ তো বিয়ের গান নয়, এ মাঙ্গলিকী নয়।
কে পেড়েছে এমন অলক্ষুণে প্যাঁচাল? কে সে?

মেয়েরা

আমি নই গো — আমরা তো নই...

ঘটক

কে গেয়েছে তবে?

[মেয়েদের মধ্যে কানাকানি ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়]

রাজপুত্র

আমিই জানি কে সে।

[টেবিল ছেড়ে উঠে চুপিচুপি সহিসকে নির্দেশ দেয়]

কোথায় কলম্যালিকের মেয়ে
খুঁজে বের কর্, দূর করে দে। সন্ধান কর্ পরে —
ঢুকতে দিল কেবা ওকে।

[সহিস মেয়েদের ভিড়ে এগিয়ে যায়]

রাজপুত্র

[বসে, মনে-মনে বলে]

নিশ্চয় ও-ই হবে,
গোল পাকাতে এসেছে সে কোমর বেঁধে হেথা,
জানি না কো কোথায় আমি লজ্জা রাখব, কোথায়
পালাব-যে।

নিজের ড্রয়িঙ সমেত পুশকিনের 'বেদেরা' কাহিনীর পাণ্ডুলিপি।
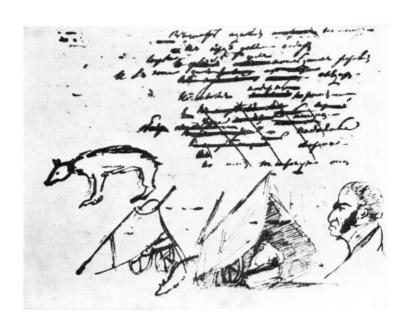
'ব্রোঞ্জ অশ্বারোহী' কাহিনীতে সেণ্ট পিটর্সবুর্গে পুশকিন বর্ণিত ১৮২৪ সালের বন্যা।
এনগ্রেভিঙ, ১৮২৪
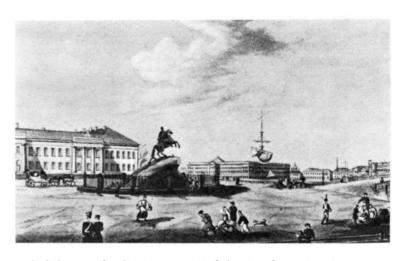
সেণ্ট পিটর্সবুর্গ, সিনেট স্কোয়ার। মহান পিটারের স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। রঙীন
এনগ্রেভিঙ, ১৮০৬

পুশকিনের 'মর্মর-অতিথি' নাটকের পাণ্ডুলিপি, তাতে তাঁর নিজের ড্রয়িঙ। ১৮৩০

'সোনার মোরগের কাহিনী'-তে পুশকিনের ড্রয়িঙ সম্বলিত তাঁর পাণ্ডুলিপির নামপত্র। ১৮৩৪

সহিস

কোথাও ওরে পেলাম না কো খুঁজে।

রাজপুত্র

যা, খুঁজে দ্যাখ ফের। জানি সে আছে হেথায়। সে-ই
গেয়েছে ওই গান।

জনেক অতিথি

আ মরি, মদের বাহার কিবা!
মাথায় চড়ে বসেছে সে, দু'পায়ে দেয় দোল —
দুঃখ কেবল বড্ড তেতো: মদে মেশাও মধু।

[বরকনে পরস্পরকে চুম্বন করে।
সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট একটা আর্ত চিৎকার শোনা যায়]

রাজপুত্র

ওই সে! ওরই ঈর্ষাভরা বিলাপ এ-যে।
[সহিসকে]
কী রে,
পেলি তাকে?

সহিস

পাচ্ছি না কো কোথাও।

রাজপুত্র

হা রে গাধা!

মিতবর

[উঠে দাঁড়িয়ে]

বরকনেকে ছুটি দেয়ার সময় নয় কি এখন?
দোরগোড়াতে বিদায় দেয়ার পুষ্প-বরিষণে?

[সকলে উঠে দাঁড়ায়]

ঘটকী

ঠিক বলেছ, সময় হল মুরগির ভোজ দেয়ার।

[বরকনেকে আগুনে-ঝলসানো মুরগির মাংস খেতে দেয়া হয়, অতঃপর তাদের ওপর লাজবর্ষণ করে বাসরঘরে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়]

ঘটকী

রাজকন্যে, মিষ্টি মেয়ে, কেঁদো না, নেই ভয়,
স্বামীর কথা মেনে চোলো।

[বরকনে বাসরঘরে চলে যায়, অতিথিরাও বিদায় নেয় একে-একে, থেকে যায় খালি ঘটকী আর মিতবর]

মিতবর

পেয়ালা কই? আজ
সারাটা রাত ঘোড়ায় চেপে টহল দিতে হবে
বাতায়নের নিচে — এখন দু-এক ফোঁটা মদে
চাঙ্গা করে নিই নিজেকে।

ঘটকী

[পেয়ালায় মদ ঢেলে দিয়ে]
নাও, খেয়ে নাও।

মিতবর

আহ্‌!

ভালোয়-ভালোয় উত্‌রে গেছে সবই, না কী বলেন?

ভোজটা বিয়ের দারুণ ছিল —

ঘটকী

সবই প্রভুর দয়া!

ভালোয়-ভালোয় উত্‌রেছে সব, একটা ব্যাপার বাদে।

মিতবর

কী সে ব্যাপার?

ঘটকী

ছুঁড়ির দলে অলক্ষ্মণে গান

গাইল তখন বেখাপ্পা এক — বাসরঘরের নয়।

মিতবর

কী সব ছুঁড়ি! — আস্থা রাখা যায় না ওদের 'পরে,

লোক-ঠকানো চাল চালবেই। কে শুনেছে কবে

এমনধারা ব্যাপার! রাজার বিবাহ-উৎসবে

গোল পাকাল ইচ্ছে করেই!.. আর না, চলি এবার,

বিদায় নিচ্ছি, ও গুরুমা।

[প্রস্থান

ঘটকী

বুক কাঁপে-যে ডরে!

বিবাহ এই শুভক্ষণে দিতে নারলাম কেন!

সূর্যস্নানের ঘর

[রাজকন্যা ও তার ধাই-মা]

রাজকন্যা

ওই শোনো — ওই বাজল শিঙা! না। সে আসে নি কো।
ধাই-মা ওগো, বিয়ের আগে যখন আমার কাছে
প্রেম-নিবেদন করত ও-সে, থাকত পাশে-পাশে,
আমায় দেখে-দেখে ও তার মিটত না কো আশ।
পরে যখন বিয়ে করল, বদলে গেল সবই।
এখন আমার ঘুম সে ভাঙায় ভোর হতে-না-হতে
চেয়ে দেখি ঘোড়া আনতে হুকুম দিচ্ছে ভোরেই;
পরক্ষণে যায় সে চলে — প্রভু জানেন কোথায়,
ফেরে রাত্রে। ফেরার পরে একটি মিষ্টি কথাও
কদাচিৎ সে বলে, ক্বচিৎ বুলিয়ে দেয় হাত
অন্যমনে আমার গালে একটি বারের তরে।

ধাই-মা

রাজকন্যে, জানিস না তো পুরুষ হল মোরগ:
কোঁকোর কোঁ-কোঁ! ঝটপটিয়ে ডানা যায়-যে উড়ে।
কিন্তু মেয়েমানুষ ভীরু মুরগি-যে পোষমানা:
বাসায় বসে তা দেয়, পালে যতেক ছানাপোনা।
পুরুষ যখন প্রেমিক তখন ধর্না দেবে ঠায়,
খাবে না, জল ছোঁবে না, চোখ আঠার মতন সেঁটে
রইবে বসে। বিয়ে হলেই — মনটা উড়ু-উড়ু:
পড়শিদের বাড়ি চলবে ব্যস্ত আনাগোনা,
বাজপাখিদের দল সঙ্গে যাবে শিকার-খোঁজে,
আবার ঘাড়ে ভুত চাপলে যুদ্ধে দেবে ঝাঁপ,
এখান যাবে সেখান যাবে — রইবে না কো ঘরে।

রাজকন্যা

কী মনে হয়, ধাই-মা? ও তার গোপন কি কেউ আছে
ভালোবাসার মানুষ?

ধাই-মা

ছি-ছি, বলাও-যে পাপ, সোনা!
আচ্ছা বল্ তো, তোরই তুল্য পাবে কোথায় ও-সে?
বুদ্ধিমতী, রূপবতী — অভাব কিসের তোর?
ধরনধারণ মিষ্টি অতি। ভাব্ দেখি একবার:
জগৎ ঢুঁড়ে মিলবে কোথাও এমন সোনার চাঁদ
তোরই তুল্য, রাজকন্যে?

রাজকন্যা

কবে ইচ্ছাপূরণ হবে — ঘর ভরে সন্তান
দেবেন আমায় প্রভু। তবে উপায় হবে জানি
নতুন করেই মনটাকে ওর ঘরমুখো বাঁধবার...
শিকারীর দল ফিরল দেখি, প্রাঙ্গণে ভিড়, স্বামী
ঘরে ফিরলেন।... কিন্তু কোথাও দেখছি না-যে তাঁকে?

একজন শিকারীর প্রবেশ}

রাজপুত্র কোথায়?

শিকারী

তিনি হুকুম দিলেন মোদের
ঘরে ফিরতে — ছেড়ে তাঁকে।

রাজকন্যা

কোথায় তিনি?

শিকারী

একা —
আছেন তিনি বিজন বনে নীপার নদীর পাড়ে।

রাজকন্যা

সঙ্গী ছাড়া রাজপুত্রে একাই ফেলে এলি
এমন স্পর্ধা তোদের? প্রভুভক্ত ভৃত্য বটে!
যা চলে যা এখ্খুনি, যা ঘোড়ায় বায়ুবেগে!
বল্ গে তাঁকে, আমিই তোদের ফেরত পাঠিয়েছি।

[শিকারীর প্রস্থান

হায় ভগবান! আছে রাত্রে একা বিজন বনে
বুনো জন্তু, চোর-ডাকাতের ভয়ঙ্কর আস্তানায়,
ভুত-পেরেতের আড্ডা — যেথায় বিপদ পদে-পদে।
এস, শিগ্গির দাও তো বাতি দেবীর পটের কাছে।

ধাই-মা

এই-যে বাছা, এখ্খুনি দিই...

নীপার-তীর, রাত্রি

মৎস্যকন্যারা

খুশির খেলায় দলে-দলে
অতল জলের গভীর থেকে
রাত্রে মোরা উঠি ভেসে
চাঁদের অমল ধবল মেখে।

খুশির খেলায় রাতবিরেতে
নদীতলের শয্যা ছাড়ি,
ওপরমুখো সাঁতার দিতে
জল ছাড়িয়ে দিই-যে পাড়ি।
কণ্ঠ মেলাও, সুর মেলে দাও
বাতাস কাঁপাও ঝনক দিয়ে,

আর্দ্র, সবুজ চুলের গোছাও
হাওয়ায় ঝেঁকে নাও শুকিয়ে।

প্রথম কন্যা

চুপ, চুপ! শোন্, বনের পাছে
কী যেন এক নড়ে বেড়ায়।

দ্বিতীয় কন্যা

আমাদের আর চাঁদের মাঝে
মাটির বুকে হেঁটে কে যায়।

[ওরা সবাই লুকিয়ে পড়ে]

রাজপুত্র

বিষণ্ণ এই জায়গাগুলো কী ভালো মোর চেনা!
চেনা যতেক খুঁটিনাটি — ওই তো হাওয়াকল!
অচল হয়ে আছে এ-কল, পড়ছে ভেঙেচুরে;
ঘুরন্ত সেই পাথরে মিষ্টি আওয়াজও আজ চুপ;
জাঁতাকলে হয় না কো গম-পেশাই — হয়তো বুড়ো
গেছেই মরে। বেশিদিন সে দুঃখী মেয়ের শোকে
ভোগে নি কো। পায়ে-চলা পথটা... ঝোপে ভরা।
অনেক বছর এপথ পায়ে মাড়ায় নি কো কেউ।
বাগান একটা ছিল জানি উঁচু বেড়ায় ঘেরা।
তার কি এমন দশা, এমন আগাছা-বন ভরা?
আহা, এ সেই ওকগাছটি, যার নিচে সে মেয়ে
আলিঙ্গনে বাঁধত আমায়, এও তো মরো-মরো,
নীরব — এ কী সম্ভব এ?..

[গাছের কাছে যায়, সঙ্গে সঙ্গে একগাদা পাতা ঝরে পড়ে ওর ওপর]

অর্থ কী এর? কেন
পাতাগুলো হলুদ হল দেখতে-দেখতে, তারা
শুকিয়ে সব ঝরে পড়ল আমার ওপর — যেন
ভস্ম-অবশেষ? ওকগাছ এখন নগ্ন, কালো
অভিশপ্ত গাছ যেন সে।

জীর্ণদেহ, অর্ধনগ্ন এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ

কেমন আছ? ভালো?
জামাই-বাবাজী গো!

রাজপুত্র

তুমি?

বৃদ্ধ

চিনলে না? দাঁড়কাক —
হেথায় আমার বাসা।

রাজপুত্র

এ কী কলের মালিক?

বৃদ্ধ

না গো,
মালিক-টালিক নই কো! বেচে দিলাম হাওয়াইকল
চুল্লিঘরের হল্লাভূতে, দাম যা পেলাম — দিলাম

মাছের মেয়েগুলোয় আমার মেয়ের খরচ বাবদ।
নীপার নদীর বালির চড়ায় টাকা এখন পোঁতা,
একচোখো এক মাছ পাহারা দিচ্ছে গুপ্তধনে।

রাজপুত্র

হায়, অভাগা পাগল হয়ে গেছে। ভাবনাগুলো
এলোমেলো, দমকা ছোটে ঝড়ের মেঘের মতো।

বৃদ্ধ

কাল রাত্রে কেন তুমি এলে না মোর ঘরে?
ভোজ ছিল-যে, আমরা ছিলাম তোমার অপেক্ষাতে।

রাজপুত্র

অপেক্ষাতে কে ছিল মোর?

বৃদ্ধ

কেন? আমার মেয়ে!
জানো, আমি দেখছি সবই পাঁচ আঙুলের ফাঁকে:
করতে পারো যা-খুশি। আর চাও তো আমার মেয়ে
মোরগ-ডাকা ভোর অবধি সঙ্গ দেবে তোমায়,
রা-টি তবু কাড়ব না কো।

রাজপুত্র

বেচারা কলমালিক!

বৃদ্ধ

কে কলমালিক? বলছি না কি, আমি-সে দাঁড়কাক —
কলের মালিক নই? দ্যাখো-না অবাক কাণ্ড ভারি:
(মনে পড়ে?) মেয়ে যখন নদীতে ঝাঁপ দিল,

আমি তখন ধেয়ে গেলাম পিছে — ইচ্ছে ছিল
একই পাহাড় থেকে লম্ফ দেব, হঠাৎ দেখি
দুই বগলের নিচে আমার গজাল দুই ডানা
শক্তপোক্ত, উড়াল দিয়ে তারা আমায় হোথায়
ধরে রাখল হাওয়ায়। আমি সেদিন থেকে আজও
উড়ে বেড়াই এদিক-সেদিক, মাঝেমধ্যে খুঁটি
পচাগলা বাসিমড়া — যেমন, মরা গোরু —
কিংবা বসি কবরখানায়, ডাকি কা — কা।

রাজপুত্র

হায়!
কে তোমাকে দ্যাখে, বুড়ো?

বৃদ্ধ

তা-ও তো বটে! আমার
দেখাশোনার লোক তো লাগেই। বুড়ো হচ্ছি যত
ছেলেমানুষি বাড়ছে ততই। তবে কপাল ভালো,
বরাতজোরে পেয়ে গেছি মাছের বাচ্চা পোনা,
সে-ই আমারে দ্যাখে।

রাজপুত্র

কে সে?

বৃদ্ধ

নাতনি আমার।

রাজপুত্র

না-না,
মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কো! বুড়ো,

খিদেয় তুমি মারা পড়বে বনে, কিংবা পশুর
পেটে যাবে। চল তুমি আমার প্রাসাদ-পুরে,
আমার সঙ্গে থাকবে, কেমন?

বৃদ্ধ

তোমার বাড়ি? না-না!
মন ভিজিয়ে বাড়ি নেবে, শেষে মুক্তোর দড়ি
লট্‌কে গলায় দেবে ফাঁসি। দিব্যি আছি হেথায়,
খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুরছি। আমি চাই নে তোমার প্রাসাদ।

[প্রস্থান

রাজপুত্র

এসব আমার কৃতকর্ম! উঃ, কী ভয়ঙ্কর!
বুদ্ধি নষ্ট হওয়া। মৃত্যু ভালো তো এর চেয়ে।
শবদেহ দেখলে আমরা সম্মান জানাই,
সদ্‌গতি চাই। মৃত্যুতে হয় সকল মানুষ সমান।
কিন্তু বুদ্ধিনষ্ট মানুষ মানুষ থাকে না-যে,
অমূল্য-যে মুখের ভাষা সে-ও তো মূল্যহীন
ও তার মুখের লাগামছেঁড়া কথায়। পশুর সমান
সে-যে, মানুষ ভাইবন্ধুর কাছে হাসির খোরাক।
সবাই তাকে ব্যঙ্গ করে, ঈশ্বরেরও দয়া
পায় না! হতভাগ্য বৃদ্ধ! হায় রে, ওকে দেখে
অনুতাপের মর্মজ্বালায় জ্বলে মরছি আমি!

শিকারী

ও-ই তো উনি! ভেবেছিলাম পাব না আর খুঁজে!

রাজপুত্র

এ কী, তোমরা এখানে-যে?

শিকারী

রাজকন্যার হুকুম।
হুজুর, তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন।

রাজপুত্র

ধুত্তোর!
অসহ্য এই উৎকণ্ঠা! দুধের শিশু আমি?
ধাই-মা'র হাত ধরা ছাড়া চলতে পারি না কো?

[প্রস্থান

[মৎস্যকন্যারা ফের ভেসে ওঠে নদীর জলে]

মৎস্যকন্যারা

ছুটব নাকি আমরা, ও বোন,
ডাঙায় ওদের পাল্লা দিয়ে?
জল ছিটিয়ে হাসব এমন
ঘোড়াগুলোয় ভয় দেখিয়ে?

আর না। আঁধার বনকে ঢাকে,
গা শিউরোয় শীতল জলে,
শোন্ রে গাঁয়ে মোরগ ডাকে,
নামল-যে চাঁদ অস্তাচলে।

প্রথম কন্যা

ও বোন, খানিক থাক্-না আরও।

দ্বিতীয় কন্যা

না ভাই — সময় হল ফেরার,
রানী মোদের কঠিন বড়,
বাপ রে, রক্ষে রাখবে না আর।

[জলে তলিয়ে যায়]

নীপার নদীর তলদেশ

[মৎস্যকন্যাদের প্রাসাদ। মৎস্যকন্যারা তাদের রানীর চারপাশে সুতো কাটে]

রানী

ও বোন, সুতো কাটা থামা। সূর্য বসে পাটে,
দের হল — দ্যাখ্, চাঁদের আলোর স্তম্ভ নামে জলে।
সাঁতার দিয়ে ওঠ্ ওপরে, খোলা আকাশ-তলে
খেল গে যা-না, তবে দেখিস জ্বালাস নে কো কারে:
আজ তোরা কেউ পথিক-জনে ফেলিস না কো ফাঁদে,
জেলের জালে ঘাস কিংবা শ্যাওলা ভরে তারে
ধাঁধায় ফেলিস না কো, দেখিস, মাছের গল্প ফেঁদে
দুধের শিশুর মন ভুলিয়ে টানিস না আর জলে।

মৎস্যশিশুর প্রবেশ]

কোথায় ছিলি তুই রে মেয়ে?

মৎস্যশিশু

ছিলাম ডাঙায়, পাড়ে
দাদুর কাছে। দাদু আমায় বলে কী তা জানো?
বলে — নদীর নিচে কবে অনেক দিন-সে আগে
মুঠো-মুঠো টাকা মোদের জন্যে ফেলেছে সে.

সে-টাকা আজ চায় সে ফেরত। কিন্তু অনেক খুঁজে
পেলাম না কো; জানি না তো টাকা কেমন জিনিস —
তবে আমি অনেক ঢুঁড়ে নদীর তলা থেকে
দিলাম এনে অঢেল ঝিনুক হরেক রঙে রাঙা,
তা-ই পেয়ে খুব খুশি দাদু।

রানী

পাগ্‌লা ভারি কৃপণ!
ওরে খুকি, যা বলি তাই শোন্, এবারের তরে
ভরসা তুই। আজ রাত্রে আসবে একটি মানুষ
নদীর পাড়ে নেমে। ও তুই রাখিস, চোখে-চোখে,
ঘনিয়ে যাস, করিস দেখা। মোদের আপনজন
লোকটি, সে তোর বাবা।

মৎস্যশিশু

সে কি, তোমায় ছেড়ে যেবা
বিয়ে করল ডাঙার মেয়েমানুষ — লোকটা সে-ই?

রানী

সেই লোক সে; মিষ্টি সম্ভাষণে বলিস তাকে
তোর জন্মের সকল কথা যা শুনেছিস তুই
আমার কাছে, বলিস তাকে আমার সকল কথাও।
আর যদি সে শুধায় তাকে মনে আছে কিনা
আজও আমার — বলিস আছে, বলিস ভালোবাসি,
আজও তাকে আমার ঘরে জানাই আমন্ত্রণ।
যা বললাম বুঝলি মেয়ে? ঠিক বুঝেছিস তো রে?

মৎস্যশিশু

ঠিক বুঝেছি।

রানী

তাহলে যা।

[একা]

সেই ভয়ানক দিনে
পাগল হয়ে দুঃখে যখন ঝাঁপ দিয়েছি জলে
বেপরোয়া, পরিত্যক্ত, সরল মেয়ে আমি,
আবার যখন ঘুম ভেঙেছে নীপার নদীর তলায়
পাষাণহৃদয়, সবলা এক মৎস্যনারী হয়ে,
তারও পরে গেছে কেটে সাত-সাতটা বছর...
প্রতিটা দিন ভোর করেছি প্রতিশোধের নেশায়।
আজকে বুঝি এল আশা পূরণ হবার দিন।

নীপার-তীর

রাজপুত্র

বিষণ্ণ এ-নদীতীরে আসি অনিচ্ছাতেও,
কিসের প্রবল আকর্ষণে, কেন-যে, না জানি...
এই মাটি এই গাছ পুরনো দিনের কথা কয়।
বড় করুণ বড্ড প্রিয় আমার তরুণ দিনের
আমার মুক্ত যৌবনেরই গল্প-যে শোনায়।
এইখানে মোর অপেক্ষাতে ছিল একদিন প্রেম —
মুক্ত-স্বাধীন, উদ্দাম প্রেম — আহ্, কী অবুঝ আমি,
এমন-যে সুখ হাতের মুঠোয় পেয়েও হারালাম,
পায়ে দলে গেলাম সে-সুখ — সুখী ছিলাম বলেই...
হায়, কী দারুণ মর্মঘাতী এসব চিন্তা আজ।
গতকালের হঠাৎ দেখাটাই হল মোর কাল।
হা রে দুঃখী, পাগল পিতা! কী ভয়ঙ্কর ও-যে!
হয়তো-বা তার দেখা মিলবে হঠাৎ আবার আজও,

হয়তো তাকে রাজি করাও যাবে এ-বন ছেড়ে
মোদের ঘরে আসতে...

[নদীতীরে মৎস্যশিশুর আবির্ভাব ঘটে]

এ কী! কাকে দেখছি আমি?
খুকুমনি, কোথা থেকে আসা হচ্ছে তোমার?

... ...

(১৮৩২)

রূপকথা

জেলে আর মাছের কাহিনী

এক যে ছিল বুড়ো আর-এক বুড়ি
নীল সাগরের কূলেরই কাছটিতে,
জরাজীর্ণ মাটির কুঁড়ে ঘরে
কাটিয়ে দিলে তেত্রিশটি বছর।
জালটি নিয়ে মাছ ধরত বুড়ো,
ঘরের দোরে সুতো কাটত বুড়ি।
একদিন-না জাল ফেললে বুড়ো,
জালে উঠল কেবল কিছু কাদা।
দু'বারের বার জাল ফেললে ফের,
জালে উঠল সমুদ্দুরের ঘাস।
তিনবারে যেই জাল ফেললে বুড়ো,
জালে উঠল একটি শুধু মাছ,
নয় সাধারণ, মাছ কিন্তু সোনার।
আকুলি আর বিকুলি গায় মাছ,
মিনতি গায় মনিষ্যি গলায়:
'হেই বুড়ো, তুই আমায় ছেড়ে দে!
খালাসি-পণ অনেক দেব তোকে,
অনেক দেব, যা শুধু তুই চাস।'
অবাক হল, ভয়ও পেল বুড়ো:
কত বছর মাছ ধরেছে সে —
কে শুনেছে মাছের মুখে কথা!
সোনার মাছকে অমনি দিল ছেড়ে,
মায়া করে বললে দরদ ঢেলে:

'কপাল নিয়ে থাক রে সোনার মাছ,
কী হবে তোর খালাসি-পণ নিয়ে।
যা ফিরে যা নীল সাগরের জলে,
খেলে বেড়াস যেখানে তোর খুশি।'

বুড়ির কাছে বুড়ো এল ফিরে,
বললে তাকে আশ্চর্য্যি ব্যাপার:
'আজকে জালে ধরেছিলাম মাছ
সোনার সে-মাছ, যেমন-তেমন নয়;
কথা কইলে আমাদেরই মতো,
নীল সাগরে বললে ছেড়ে দিতে,
খালাসি-পণ দিতে চাইলে অনেক:
দিতে চাইলে যা চাইব সব।
ভয় হল গো খালাসি-পণ নিতে,
নীল সাগরে অমনি ছেড়ে দিলাম।'
এই-না শুনে বকে উঠল বুড়ি:
'কী বোকা তুই, হাঁদা গঙ্গারাম!
খালাসি-পণ নেবার মুরোদ নেই!
নিলেই হোত কাঠের বারকোশ,
আমাদেরটা একবারে-যে ভাঙা।'

চলল বুড়ো নীল সাগরের কোলে,
দেখে, সাগর মৃদুমন্দ দোলে।
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি,
সাঁতরে এসে মাছ বললে তাকে:
'কী রে বুড়ো, কী তোর চাই বল!'
সেলাম করে জবাব দিলে বুড়ো:
'মেহেরবানি করো গো মীনরানী,
বুড়ি আমায় বড়োই দিলে গাল,

শান্তিতে আর তিষ্ঠুতে দেয় না:
একটা নতুন বারকোশ তার চাই,
আমাদেরটা একেবারে ভাঙা।'
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ:
'যা ফিরে যা, দুঃখু করিস নে,
নতুন বারকোশ গোটাটাই পাবি।'
বুড়ির কাছে ফিরে এল বুড়ো,
সামনে বুড়ির নতুন বারকোশ।
আরো বেশি মুখ ছোটালে বুড়ি:
'কী বোকা তুই, হাঁদা গঙ্গারাম!
ভারি আমার, চাইলেন বারকোশ!
বারকোশে আর কতই-বা রাজকোষ?
মাছের কাছে ফের যা হাঁদারাম,
সেলাম করে চাইবি কোঠাবাড়ি।'

চলল বুড়ো নীল সাগরের কোলে,
(ঘুলিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ)।
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি,
সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ:
'কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?'
সেলাম করে জবাব দিলে বুড়ো:
'মেহেরবানি করো গো মীনরানী!
আরো বেশি মুখ ছুটছে বুড়ির,
শান্তিতে আর তিষ্ঠুতে দেয় না:
খেঁকী মাগী চাইছে কোঠাবাড়ি।'
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ:
'যা ফিরে যা, দুঃখু করিস নে,
তথাস্তু: তোর কোঠাবাড়িই হবে।'
ফিরল বুড়ো নিজের কুঁড়ে ঘরে,

কোথায় কুঁড়ে? চিহ্নও তার নেই!
সামনে দেখে দিব্যি কোঠাবাড়ি,
পাকা ইঁটের ধবল চিম্‌নি-সারি,
নক্সা তোলা দেউড়িটা ওক-কাঠের।
জানলা খুলে বসেছে তার বুড়ি,
মুখ ছুটিয়ে সে কী গালাগালি:
'কী বোকা তুই, হাঁদার হাঁদারাম!
চাইলি কিনা মাত্র কোঠাবাড়ি!
যা ফিরে যা, মাছকে দিবি সেলাম:
গতর-খাটা কিষাণী আর না,
জমিদারনী বনেদী চাই হতে।'
চলল বুড়ো নীল সাগরের কোলে,
(নীল সাগরে উথালপাথাল ঢেউ)।
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি,
সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ:
'কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?'
সেলাম করে জবাব দিলে বুড়ো:
'মেহেরবানি করো গো মীনরানী!
আগের চেয়েও জিদ ধরেছে বুড়ি,
শান্তিতে আর তিষ্ঠুতে দেয় না:
কিষাণী আর থাকতে চাইছে না কো,
জমিদারনী বনেদী চায় হতে।'
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ:
'যা ফিরে যা, দুঃখু করিস নে।'

বুড়ির কাছে ফিরে এল বুড়ো,
দেখে — ওমা, মস্ত যে এক পুরী।
অলিন্দেতে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি
দামি লোমের জামায় অঙ্গ ঢাকা,

নক্সা-তোলা জরির টুপি মাথায়,
গলায় দোলে মণি-মুক্তোর মালা,
আঙুলগুলোয় সোনারই অঙ্গুরী,
চরণজোড়ায় রাঙা জুতোর শোভা।
চতুর্দিকে তটস্থ দাসদাসী;
কাউকে মারে, ঝুঁটি ধরে টানে।
বুড়ো তখন বুড়িকে তার বলে:
'কুশল ম্যানি, রানী বনেদিনী,
জমিদারনী, সাধ মিটল তোর।'
শুনেই বুড়ি লাগালে চোটপাট,
পাঠাল তায় আস্তাবলের কাজে।

হপ্তা-খানেক, হপ্তা-দুয়েক গেল,
আরো ক্ষেপে ঝোঁক ধরলে বুড়ি,
মাছের কাছে ফের পাঠাতে চায়:
'আবার গিয়ে মাছকে দিবি সেলাম:
জমিদারনী বনেদী আর নয়,
হব এবার একচ্ছত্র রানী।'
ভয়ে বুড়ো মিনতি জানায়:
'সে কী গিন্নি? পিঠে গিলেলি খুব?
চলতে নারিস, কইতে নারিস কথা,
লোক হাসাবি, গোটা রাজ্যের লোক।'
আরো ভীষণ ক্ষেপে উঠল বুড়ি,
স্বামীর গালে মেরে বসল চড়:
'তুই চাষা আর জমিদারনী আমি,
আমার সঙ্গে মুখে মুখে কথা?
ভালোয় ভালোয় যা বলছি তা কর্,
নইলে ধরে পাঠাব লোক দিয়ে।'

সাগর পানে রওনা দিলে বুড়ো,
(নীল সে-সাগর কালোয় কালিন্দী)।
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি,
সাঁতরে এসে মাছ বললে তাকে:
'কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?'
সেলাম করে জবাব দিলে বুড়ো:
'মেহেরবানি করো গো মীনরানী!
আবার বুড়ি করছে দাপাদাপি:
জমিদারনী থাকতে চায় না আর,
হতে চাইছে একচ্ছত্র রানী।'
জবাব দিয়ে বললে সোনার মাছ:
'যা ফিরে যা, দুঃখু করিস নে,
বেশ তো, মহারানীই হবে বুড়ি।'

বুড়ো এল বুড়ির কাছে ফিরে,
ওমা, এযে রাজার দরবার!
সে-দরবারে দেখে কি, তার বুড়ি
বসে আছে মহারানীর বেশে
তটস্থ সব আমির-ওমরাহ,
ঢেলে দিচ্ছে সাগরপারের সুরা,
দাঁতে কাটছে লিখন-আঁকা কেক,
চতুর্দিকে ভীম ভয়ানক কোটাল,
কাঁধে সবাই উঁচিয়ে আছে কুঠার।
দেখেই বুড়োর ভয়েতে প্রাণ কাঁপে!
সেলাম করলে চরণ ছুঁয়ে বুড়ির,
বললে, 'কুশল, ভয়াল মহারানী,
এবার দেখি সাধ মিটল তোর।'
বুড়ি তাকে দেখলে নাকো চেয়েও,

হুকুম দিলে চোখের ইশারায়।
ছুটে এল আমির-ওমরাহ,
ভাগিয়ে দিলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে।
দরজায় সব ভীম ভয়ানক কোটাল
একটু হলেই ফেলত বুঝি কেটে।
হাসাহাসি করলে যত লোকে:
'ঠিক হয়েছে বুড়ো বেকুব তোর,
এবার বেকুব এই শিক্ষে নে:
বামন হয়ে হাত দিস নে চাঁদে!'

হপ্তা-খানেক, হপ্তা-দুয়েক গেল,
আরো ক্ষেপে জেদ ধরলে বুড়ি:
স্বামীর খোঁজে ছুটল সভাসদ,
ধরে আনলে মহারানীর কাছে।
বুড়োকে তার বললে বুড়ি তখন:
'আবার গিয়ে মাছকে দিবি সেলাম।
হতে চাই নে একচ্ছত্র রানী,
সমুদ্দুরের অধীশ্বরী হব,
থাকব মহাসাগর-সমুদ্দুরে,
সোনার মাছও হবে আমার বাঁদী,
খাটবে আমার ফাইফরমাশ যত।'

ওজর করার সাহস হল না কো,
আপত্তি আর মুখেতে ফুটল না।
চলল বুড়ো নীল সাগরের কোলে,
সাগর জুড়ে কালিন্দী তুফানে,
রাগে গরগর, ফুঁসে উঠছে ঢেউ,
ছুটে আসছে গর্জে উঠে-উঠে।
সোনার মাছকে করলে ডাকাডাকি,

সাঁতরে এসে বললে সোনার মাছ:
'কী রে বুড়ো, কী তোর চাই ফের?'
সেলাম করে জবাব দিলে বুড়ো:
'মেহেরবানি করো গো মীনরানী,
কী যে হল হতচ্ছাড়ি মাগীর!
মহারানী থাকতে চায় না আর,
সমুদ্দুরের অধীশ্বরী হবে,
থাকবে মহাসাগর-সমুদ্দুরে,
নিজেই তুমি হবে বুড়ির বাঁদী,
খাটবে বুড়ির ফাইফরমাশ যত।'
একটি কথাও বলল না কো মাছ,
লেজটি দিয়ে ঝাপট মেরে শুধু
তলিয়ে গেল গহীন জলতলে।
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুড়ো
কী আর করে, ফিরল বুড়ির কাছে —
ফিরেই দেখে, আবার সেই কুঁড়ে,
বুড়ি বসে রয়েছে চৌকাটে,
সামনে ভাঙা বারকোশটা নিয়ে।

(১৮৩৩)

সোনার মোরগের কাহিনী

তিন ও নয়ের সে কোন দেশে,
তিন ও দশের রাজ্যশেষে,
এক-যে ছিল রাজা দাদন,
যৌবনেতে ভীম-ভীষণ,
আশেপাশের রাজ্যে নানা
ফিরত কেবল দিয়ে হানা।
শেষে যখন হল বুড়োই,
ভাবলে — লড়াই থেকে জিরোই,
শান্তিতে হোক দিনাতিপাত;
হায় রে, তখন কী উৎপাত
লাগায় বুড়ো-রাজার দেশে
আশেপাশের পড়শী এসে।
রাজ্যে ধরো, চার সীমানা,
রক্ষা করা খুব সোজা না,
পুষতে হল সৈন্যদল,
না-হয় যাতে কমতি বল।
সেনাধ্যক্ষ অকেজো নয়,
ঘুম মারে নি, হলে কী হয়,
দক্ষিণেতে হয়তো আছে,
হামলা হল পুবের কাছে,
— সামাল যদি দেওয়া গেল,

সাগরপথে শত্রু এল।
দাদন রাজা মনের জ্বালায়
কেঁদেই ফেলে, ঘুম চলে যায়।
এমন করে বাস কি চলে?
শেষে রাজা দাসকে বলে,
'আছে যে এক জ্ঞানী-গণক,
যদিও খোজা, নপুংসক,
জানিয়ে মোর অভিবাদন
ব'লো ডাকছে রাজা দাদন।'

এলেন গুণী, থলিয়া খুলে
সোনার মোরগ ধরেন তুলে।
বলেন, 'রাজা, মোরগটিরে
বসিয়ে রেখো পুরীর শিরে;
পাখিটি মোর নয় সাধারণ,
রাজ্য লাগি নেবে যতন:
শান্তি যদি থাকে, তবে
চুপটি করে বসে রবে;
কিন্তু যদি থাকে শঙ্কা,
বাজে শত্রুর রণডঙ্কা,
হামলা করে কোনো আপদ,
ঘনায় অনাহূত বিপদ,
অমনি পাখি চুড়ো থেকে
ঝটপটিয়ে উঠবে ডেকে,
উঁচিয়ে ঝুঁটি যেদিক পানে
চাইবে, জেনো ভয় সেখানে।'
খোজায় রাজা কতই সোনা
শিরোপা দিলে, যায় না গোনা।
'শুধব জ্ঞানী এই উপকার,

জানান দিও ইচ্ছে তোমার,
অমনি সেট্য হবে পূরণ,'
ধন্যি দিয়ে বলে দাদন।

মোরগ উঁচু চুড়োতে ঠায়
রইল দেশের সুখ পাহারায়।
বিপদ দেখা গেলে অমনি
সেদিক চেয়ে সামনা-সামনি
ধড়মড়িয়ে, ঝটপটিয়ে
উঠত ডেকে পাখিটি এ,
বলত, 'রাজা, কোঁকর-কোঁ-ও,
ভয় নেই গো, পাশ ফিরে শো!'
পড়শীরা সব শান্তি দিল,
যোঝাযুঝি ক্ষান্তি দিল।
দাদন রাজা চতুর্দিকেই
হানল আঘাত শত্রুদিগে।

দু'য়েক বছর চলল বেশ,
শান্ত পাখি, শান্ত দেশ;
হঠাৎ কী রোল, কী আলোড়ন
ঘুম ভেঙে চায় রাজা দাদন।
'ওঠো রাজা, পিতা মোদের,
ঘনায় বুঝি বিপদ-সে ফের।'
ছুটেই এসে ক্ষিপ্রগতি
বললে রাজার সেনাপতি।
দাদন তবু তুলছেই হাই,
'কী যে বিপদ, বলো-না ছাই।'
'মোরগে ফের ডাক ছাড়ছে
লোকজনেরা ভয়ে মরছে।'

দেখেন রাজা — সত্যি পাখি
পুবের পানে উঠছে ডাকি।
'ওহে সবাই জলদি করে
ঘোড়ার পিঠে ওঠো চড়ে!'
সদলবলে রণসাজে
পুবে পাঠায় যুবরাজে।
থামল যত হুলস্থুল,
রাজাও আবার ঢুলঢুল।

আট দিনেতেও অতঃপর
সৈন্যদলের নেই খবর;
লড়াই হল, না হল না,
কিছুটি তার যায় না শোনা।
ডাকে মোরগ আরেক বার,
নতুন সেনা করে জোগাড়
ছোটো ছেলেয় রাজা পাঠায়,
দাদার হবে বড়ো সহায়।
ডাক থামাল পাখি এবারও,
খবর তবু নেইকো কারো!
ফের আট দিন চলে-যে যায়;
লোকে ভয়ে সময় কাটায়;
ফের পাখি কয়, বিপদ কী যে!
এবার সেনা সাজিয়ে নিজে
রওনা দিল রাজা তখন,
ফল হবে কি, ভাবে দাদন।

রাস্তা চলে সৈন্যদল,
হয়রান হয়, ফুরায় বল।
নেই কো চিহ্ন হানাহানির,

নেই সমাধি, নেইকো শিবির।
'এ যে আজব কাণ্ড কেমন,'
ভেবে না পায় রাজা দাদন।
আট দিনেতে পাহাড় পরে
সৈন্য পরিচালন করে।
দেখল উঁচু গিরির মাঝে
শিবির কিবা রেশমী-সাজে।
থমথমে তার চারিধার,
সরু খাদের ভেতর তার
মরা সৈন্যের ছড়াছড়ি।
শিবির পানে তড়িঘড়ি
চলল রাজা... কী দৃশ্য রে!
দুই ছেলে তার সামনে পড়ে,
কিরীটও নেই, নেই বর্ম,
কে জানে এর কোন মর্ম,
বেঁচে তো আর নেই কো কেহ,
এ-ওর অস্ত্রে বিদ্ধদেহ।
চরছে ঘোড়া আশেপাশে
রক্তে মাখামাখি, ঘাসে...
হাহাকারে দাদন কাঁদে,
'হা-রে কপাল! পড়ল ফাঁদে
দু' বাজপাখি ছেলে আমার!
যমেই নেবে মোরে এবার।'
রাজার সাথে কাঁদে সবায়,
উপত্যকা শোকে লুটায়,
গিরির বুকও ফাটে-ফাটে,
হঠাৎ তাঁবুর চৌকাঠে কে...
সরিয়ে দিয়ে পর্দাখানি
শামাখানের মহারানী

উজল করে, ঊষা যেমন,
আলতো পায়ে দেয় দর্শন।
সূর্যোদয়ে রাতের পাখি
সম দাদন বিভোর থাকি
রানীর পানে নয়ন তুলে
পুত্রশোকও গেল ভুলে।
রাজার দিকে মধুর হেসে
সুন্দরী তার কাছে এসে
বাহুলগ্ন করে ধীরে
রাজায় নিয়ে যায় শিবিরে।
বসিয়ে তারে সযতনে
তৃপ্ত করে পানভোজনে,
শোয়ালে এক রাজশয্যায়,
সোনার জরি পাতা-যে তায়।
তারপরেতে সম্মোহিত,
বশীভূত যথাবিহিত
দাদন মায়াবিনীর মায়ায়
সাত-সাতটি দিবস কাটায়।

এবার যেতে হয়-যে ফিরে --
সঙ্গে নিয়ে সুন্দরীরে,
দাদন রাজা সদলবলে
রাজধানী-দিক রাস্তা চলে।
আগেই চলে গুজব যত,
সত্যি-মিথ্যে রটায় শত।
রাজধানীতে রাজবরণে
জুটল সকল লোক তোরণে
রথের পিছু-পিছু রাজার
ছুটল মানুষ হাজার হাজার।

রাজারও সুখ ধরে না আর,
হঠাৎ চোখে পড়ল-যে তার,
মাথায় স্যারাসনী টুপি
ভিড়ের মধ্যে চুপিচুপি
দাঁড়িয়ে খোজা ধবলবাস,
ঠিক যেন এক মরাল-হাঁস।
ডাকলে রাজা, 'গণৎকার,
নাও পুষিয়ে আশ তোমার।'
'শোনো রাজা,' গণক বলে,
'ঋণ-শোধবোধ হোক তাহলে।
আছে মনে, সে-উপকার
শুধবে বলেছিলে আমার।
প্রথম যা মোর ইচ্ছে হবে
করবে পূরণ — বলছি তবে:
দাও আমারে, করব নিকে,
শামাখানের রাজরানীকে।'
কপালে চোখ উঠল রাজার,
'বলছ কী হে, কী আবদার!
নাকি তোমায় দানোয় পেল,
মাথা খারাপ হয়েই গেল,
কাণ্ডজ্ঞান আছে ঘটে?
কথা আমি দিলাম বটে,
কিন্তু সীমা আছে তো তার,
সুন্দরী তোর কী দরকার!
জানিস কি তুই আমি কে?
তারচে' বরং সোনা নে,
রাজার ঘোড়া, আধ-রাজত্ব,
আছে চাইবার সবকিছু তো।'
এসব রাজা বললে তাকে,

খোজা তার জেদ বজায় রাখে,
'দাও আমারে, করব নিকে
শামাখানের রাজরানীকে।'
এই না শুনে রেগে রাজা
ফেললে থুতু — 'উচিত সাজা
পাবিই শুধু, আর কিছু নয়,
পাপাত্মা তুই, কত-বা সয়,
ভালোয়-ভালোয় পড়্-না সরে!
ভাগাও খোজার ঘাড়টি ধরে।'
চাইল বুড়ো জবাব দিতে,
তর্ক কি হয় রাজ-সহিতে?
রাজা করে দণ্ডাঘাত,
প্রাণ হারিয়ে বুড়ো পপাত,
শিউরে ওঠে সে-রাজধানী —
কিন্তু শামাখানের রানী
হি-হি হাসে! বাপরে বাপ,
ভয় নেই, এ মস্তো পাপ!
রাজারও ডর লেগেছিল,
হাসিতে তাও কণ্ঠ দিল।
এবার রাজা পশে নগরে...
হঠাৎ কিসের ধ্বনি ওপরে,
সবাই দেখে, চুড়ো ছেড়ে
উড়ে মোরগ আসছে তেড়ে,
সোজা রাজার রথে নেমে
বসল মাথায়, একটু থেমে
ঝটপটিয়ে ঠোকর দিয়ে
দূর গগনে যায় মিলিয়ে।
...গড়িয়ে পড়ে রাজা দাদন,
এক নিমেষেই হল মরণ।

হঠাৎ রানী হল উধাও,
আদৌ যেন না-ছিল সে-ও।
আজব কথা; বলে ইঙ্গিত —
কিসে-বা হিত, কিসে অহিত।

(১৮৩৪)

টীকা

চাদায়েভের উদ্দেশে

পুশকিনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ, রুশী লেখক, দার্শনিক ও জ্ঞানপ্রচারক পিওতর চাদায়েভের (১৭৯৪-১৮৫৬) উদ্দেশে এটি লেখা।

সমুদ্র, বিদায়

'সমাধির শিলা' — সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ, যেখানে ১৮২১ সালে নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন নাপোলিয়ঁ।

'নিল আমাদের আরেক প্রতিভা লুটে' — বায়রন। গ্রীসে তিনি মারা যান ১৮২৪ সালের ১৯ এপ্রিল। গ্রীক জনগণের মুক্তি-আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

তোমাকে...

আন্না পেত্রভনা কের্নের উদ্দেশে। তাঁর সঙ্গে পুশকিনের প্রথম পরিচয় পিটর্সবুর্গে, ১৮১৯ সালে। মিখাইলোভ্স্কয়েতে নির্বাসনে থাকাকালে কবির সঙ্গে আবার তাঁর দেখা হয় ১৮২৫ সালের গ্রীষ্মে, পার্শ্ববর্তী ত্রিগোর্স্কয়ে মহালে তিনি তখন বেড়াতে এসেছিলেন।

শীতসন্ধ্যা

পুশকিনের বৃদ্ধা ধাইমা আরিনা রোদিওনোভ্নার উদ্দেশে। নির্বাসন থেকে তাঁর সম্পর্কে পুশকিন লেখেন, 'সন্ধ্যায় আমার ধাইমা কাহিনী শোনায়; সে-ই আমার একমাত্র বন্ধু, শুধু ওর সাহচর্যই আমার কাছে বিরক্তিকর লাগে না।'

সাইবেরিয়ায়...

সাইবেরিয়ায় কয়েদ-খাটুনীতে নির্বাসিত ডিসেম্ব্রিস্টদের উদ্দেশে। পুশ্চিনের কাছে পত্রে পুশকিন এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন, তার জবাবে ডিসেম্ব্রিস্ট কবি আলেক্সান্দর অদোয়েভস্কি যে কবিতা লেখেন তার শুরুটা এই:

দীপ্ত ধ্বনির তন্ত্রীবাদন
শুনতে পেল মোদের শ্রবণ...

আরিঅন

কবিতাটি লিখিত ১৮২৭ সালের ১৬ জুলাই। পাঁচজন ডিসেম্ব্রিস্টের মৃত্যুদণ্ডের (১৮২৬ সালের ১৩ জুলাই) সঙ্গে এর সম্পর্ক সন্দেহাতীত। কবি এতে পরোক্ষে ডিসেম্ব্রিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। কিংবদন্তি অনুসারে প্রাচীন গ্রীক কবি ও গায়ক আরিঅনকে সাগরে সলিলসমাধি থেকে রক্ষা করে তাঁর গানে মুগ্ধ এক ডলফিন। রূপকার্থে কবি এই প্রসঙ্গটিই অবলম্বন করেছেন।

'সুন্দরী, তুমি গেয়ো না মধুক্ষরা'

সুরকার মিখাইল গ্লিনকা বলেছেন, কবিতাটি পুশকিন লিখেছিলেন 'জর্জিয়ার সুরের ছাঁদে, যা তিনি দৈবাৎ শুনেছিলেন' গ্লিনকার শিষ্যা আন্না অলেনিনার পরিবেশনে।

'সে-ছায়ামূর্তি মোহিনী সর্বনাশী' — স্পষ্টতই মারিয়া রায়েভ্স্কায়া-ভল্‌কোন্‌স্কায়া।

আন্‌চার

আন্‌চার — মালয় দ্বীপপুঞ্জের বিষাক্ত উদ্ভিদ। এর রসে সেখানকার উপজাতিরা তাদের তীরমুখ মাখিয়ে নিত।

'জর্জিয়ার শৈলশিরে রাত্রি...'

কবিতার প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে বোঝা যায় যে ১৮২০ সালের গ্রীষ্মে জেনারেল রায়েভ্স্কির পরিবারের সঙ্গে ককেশাসে তাঁর প্রথম ভ্রমণ এবং মারিয়া রায়েভ্স্কায়া-ভল্‌কোন্‌স্কায়ার প্রতি তাঁর অনুরাগে কবিতাটি অনুপ্রাণিত।

ককেশাস

'আরজ্রুমে ভ্রমণ'কালে পুশকিনের পথ-চলতি স্মৃতির সঙ্গে কবিতাটি সম্পর্কিত। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির আরো কয়েকটি ছত্র ছিল যা সেন্সরের আশঙ্কায় পুশকিন কখনো প্রকাশ করেন নি। ছত্রগুলি এই:

এমনিভাবে আইন পিষে ফেলছে স্বাধীনতা,
ক্ষমতা-পদদাপে বন্য উপজাতিরা দাস,

এমনিভাবে ফুঁসছে ক্রোধে নীরব ককেশাস,
অনাত্মীয় শক্তি তারে দেয় কঠিন ব্যথা...

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

'দু'বাহুবেষ্টনে যবে...'

কবির স্ত্রী নাতালিয়া গন্‌চারোভার উদ্দেশে।

'অলৌকিক স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছি আমার...'

Exegi monumentum — এই শিরলিপিটি 'মেলপোমেনের উদ্দেশে' শীর্ষক হোরাশিওর গাথা-কবিতা থেকে।

'আলেক্সান্দরী থাম' — ১ম আলেক্সান্দরের স্মৃতিতে পিটর্সবুর্গের প্রাসাদ-চত্বরে নির্মিত গ্রানিট স্তম্ভ।

বেদেরা

কবিতাটি পুশকিন লিখতে শুরু করেন ১৮২৪ সালের জানুয়ারিতে; ওদেসা থেকে মিখাইলোভ্‌স্কয়েতে নির্বাসিত হওয়ার আগে এর প্রথম তিনটি অংশ (১৪৫টি পঙ্‌ক্তি) খসড়ায় লেখা হয়ে গিয়েছিল। মিখাইলোভ্‌স্কয়েতে আসার মোটামুটি দু'মাস পরে তিনি 'বেদেরা' কবিতাটি নিয়ে নতুন করে কাজে লাগেন এবং অসাধারণ দ্রুততায় তা শেষ করেন। পুস্তকাকারে কাব্যটি বেরোয় কেবল ১৮২৭ সালে (রচয়িতার নাম তাতে ছিল না, শুধু এইটুকু লেখা ছিল যে কবিতাটি '১৮২৪ সালে লিখিত')।

'...আছে এক কাহিনী প্রাচীন' — নির্বাসিত প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের কথা বলা হচ্ছে।

ব্রোঞ্জ-অশ্বারোহী

পুশকিনের এই শেষ কাহিনী-কাব্যটি রাশিয়ার ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর বহু বছরের ধ্যান-ধারণার কাব্যিক খতিয়ান, লেখেন বোল্‌দিনোতে, ১৮৩৩ সালের অক্টোবরে।

কাব্যে যে বন্যার কথা আছে সেটা ঘটে পিটর্সবুর্গে ১৮২৪ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে। প্রচণ্ড সর্বনাশা হয়েছিল সেই বন্যা। পুশকিন তখন ছিলেন মিখাইলোভ্‌স্কয়েতে। বন্যার বিশদ বিবরণ জানার জন্যে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না, বিপন্নদের জন্যে তাঁর সহবেদনা অতি উল্লেখযোগ্য। ১৮২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে ভ্রাতার নিকট পত্রে তিনি লেখেন: 'এ বন্যা আমার মন থেকে যাচ্ছে না।'

বন্যার্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে তিনি জ্ঞান করেন এবং লেখেন, 'তুমি যদি কোনো হতভাগ্যকে সাহায্য করার কথা ভাবো তাহলে অনেগিনের টাকা দিয়ে (অর্থাৎ 'ইয়েভ্‌গেনি অনেগিন' কাব্যের প্রথম অধ্যায় থেকে প্রাপ্য টাকা — সম্পাঃ) সাহায্য ক'রো। তবে কথা কয়ে বা লিখে কোনো সোরগোল তুলে নয়, এই অনুরোধ রইল।'

মোত্‌সার্ট ও সালিএরি

মিখাইলোভ্‌স্কয়ে গ্রামে পুশকিন নাটকটি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন ১৮২৬ সালে, শেষ করেন বোল্‌দিনোতে ১৮৩০ সালের ২৬ অক্টোবর। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন কাব্যনাট্যটির নাম দেবেন 'ঈর্ষা'।

ইতালীয় সুরকার আন্তনিও সালিএরি (১৭৫০-১৮২৫) মোত্‌সার্টকে বিষ দিয়েছিলেন বলে তাঁর মৃত্যুশয্যার স্বীকৃতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় ১৮২৪-১৮২৫ সালের ইউরোপীয় সংবাদপত্রে। বোঝা যায়, পুশকিনের কাছে এই খবর আসায় নাটকটি লিখতে তিনি প্ররোচিত হন। মৃত বন্ধুর সম্মানরক্ষায় সালিএরির অনুরাগীরা বলেন যে তাঁর এই তথাকথিত 'স্বীকৃতি' নেহাত একটা মানসিক বিকৃতির প্রকোপ ছাড়া কিছু নয়। পুশকিনের সমকালীন কবি প. আ. কাতেনিন পর্যন্ত তাঁকে এই অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি নাটকের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন একটা মিথ্যা অভিযোগকে। তবে সাম্প্রতিক কিছু গবেষক দেখিয়েছেন যে সালিএরি সত্যিই দোষী ছিলেন।

পুশকিনের জীবদ্দশায় একমাত্র তাঁর যে নাটক মঞ্চস্থ হয় তা হল 'মোত্‌সার্ট ও সালিএরি', ১৮৩২ সালের ২৭ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারিতে তা অনুষ্ঠিত হয় পিটর্সবুর্গের বড়ো থিয়েটরে।

'ইফিগেনিয়া' — জার্মান সুরকার গ্লুক'এর একটি অপেরার উল্লেখ।

'ভোই কে সাপেতে' (voi che sapete) – মোত্‌সার্টের 'ফিগারোর বিবাহ' অপেরায় কেরুবিনোর আরিয়া।

'তারারা' — বোমার্শেই'র কথা অবলম্বনে সালিএরির অপেরা।

'তাহলে বুয়োনারত্তি? তাঁর নামে কলঙ্কের দাগা দিল কি...' — খ্রীষ্টের মৃত্যুকালীন বিক্ষেপ ও যন্ত্রণা হুবহু দেখাবার জন্যে রেনেসাঁস-যুগের মহান ইতালীয় শিল্পী মিকায়েল-এঞ্জেলো বুয়োনারত্তি নাকি তাঁর মডেলকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন এমন একটা তৎকাল-প্রচলিত গুজবের কথা বলা হচ্ছে।

প্রস্তর-অতিথি

মিখাইলোভ্‌স্কয়েতে ১৮২৬ সালে নাটকটির পরিকল্পনা, এটি সমাপ্ত হয় ১৮৩০ সালের ৪ নভেম্বর, বোল্‌দিনোতে।

নাটকে ডন জুয়ানের (সুবিখ্যাত স্পেনীয় নাগর দোন হুয়ান, যার নামটি

হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষণসূচক) একটা স্বকীয় প্রতিকৃতি এ'কেছেন পুশকিন, এখানে কবি তাঁকে দেখিয়েছেন প্রেমাবেগের কবি, 'প্রেমগীতের উদ্‌গাতা' হিসেবে।

মোত্‌সার্টের 'দোন জুয়ান' অপেরায় দা পন্তে লিখিত লিব্রেতো থেকে শিরোলিপিটি নেওয়া।

'রাতের পাহারাদার শোনো ওই হাঁকে টেনে-টেনে: 'শান্ত থাকো!'..' — স্পেনে নৈশ প্রহরীদের বলা হত সেরেনোস ('সেরেনো,' অর্থাৎ শান্ত, এই কথাটি থেকে), নিয়মিত ব্যবধানে তারা সময় আর আবহাওয়ার খবর জানাত।

মৎস্যকন্যা

১৮২৬ সালে মিখাইলোভ্‌স্কয়েতে নির্বাসনে থাকার সময় এটির পরিকল্পনা। এ নিয়ে কবি মূলত খাটেন ১৮২৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৩২ সালের এপ্রিলের মধ্যে। পাণ্ডুলিপিতে শিরনাম ছিল না; সেটি দেন 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী। পত্রিকাটিতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে।

আলেক্সান্দর পুশকিন • প্রথম খণ্ড • কবিতা